রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্ব : একটি দার্শনিক বীক্ষা

পি.এইচ.ডি (কলা শাখা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক :

পম্পা রায়

তত্ত্বাবধায়ক :

ঝুমা চক্রবর্তী

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

Certified that the Thesis entitled

রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্ব:
একটি তুলনামূলক বিচার

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof Jhuma Chakraborty, Department of Philosophy

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Jhuma Chakraborty.
Countersigned by the Supervisor :
Dated : 29.12.22.

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Pampa Kay
Candidate :
Dated : 29.12.2022

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই সীমিত গবেষণাপত্রটি শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ডঃ ঝুমা চক্রবর্তীর সুগভীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সুসম্পন্ন হয়েছে। তাঁর অকুণ্ঠ উৎসাহে বিষয়টি লিখতে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাঁর মূল্যবান উপদেশ, উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এই গবেষণা পত্র সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। তিনি তাঁর বহু মূল্যবান সময় ব্যয় করে এই গবেষণার উপযোগী গ্রন্থগুলি আমাকে পড়িয়েছেন এবং যত্নের সাথে আমার গবেষণা পত্রটি সংশোধন করে দিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি নানা ভাবে আমার মানসিক উদ্যম জুগিয়েছেন। তাই তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া আমি ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সৌমিত্র বসু মহাশয়কে, যিনি বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। একই সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অপরাপর সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকলাম।তাঁদের সকলের বিনম্র সহানুভূতির ফলে এই গবেষণা পত্র সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নকালীন যাঁদের কাছে অধ্যায়নের সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ আমার দর্শনশাস্ত্রের সেই শিক্ষাগুরু অধ্যাপিকা সবুজকলি সেন এবং আমার অন্যান্য সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আমার ঋণ স্বীকার করছি। আমার পিতা ও মাতাকে স্বহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণা পত্রটি লেখায় যে সমস্ত গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি সে সমস্ত গ্রন্থকারদের কাছে আমার ঋণ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ভবন গ্রন্থাগার থেকে আমি নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছি। তাই ঋণ স্বীকার করছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ভবন গ্রন্থাগার-এর কাছে। এছাড়া ডি.টি.পি টাইপিস্ট ও বাইন্ডারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকলাম। পরিশেষে আমার যে বন্ধুদের সহৃদয় সাহায্য পেয়েছি তাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা – ৭০০০৩২

বিনীত --
পম্পা রায়

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	১ - ৭
২.	প্রথম অধ্যায় রবীন্দ্র উদ্বৃত্ত তত্ত্ব	৮ - ৪০
৩.	দ্বিতীয় অধ্যায় রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন	৪১ - ৮২
৪.	তৃতীয় অধ্যায় কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শন	৮৩ - ১২০
৫.	চতুর্থ অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা	১২১ - ১২৮
৬.	পঞ্চম অধ্যায় উপসংহার	১২৯ – ১৩৬
৭.	গ্রন্থপঞ্জী	১৩৭ - ১৫০

ভূমিকা

শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে শিক্ষার মাধ্যমেই একজন মানুষ আদর্শ জীবনের অধিকারী হয়। জীবন চলার পথে শিক্ষা যে অপরিহার্য তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি মানুষকেই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় একথা সত্য। কিন্তু হটাৎ যদি প্রশ্ন ওঠে শিক্ষা কি? কিম্‌বা শিক্ষা বলতে ঠিক কি বোঝায়? তাহলে ব্যাপারটি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য সকল ব্যক্তি সমভাবে গ্রহণ করেন না। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই এ বিষয়ে অবগত যে, আধুনিক চিন্তাবিদ্‌রা শিক্ষাতত্ত্বে নতুন ভাবধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন এবং আদর্শ জীবন গড়ে তোলার কথা বলেছেন। তাঁদের চিন্তার রেশটা কিছুটা আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে রয়ে গেছে বলে মনে হয়। বিভিন্ন দার্শনিক এবং চিন্তাবিদ্‌ শিক্ষার মূল লক্ষ্য, প্রকৃতি, পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি, শ্রী অরবিন্দ প্রত্যেকেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে কোনো স্থির গতানুগতিক নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন নি। এঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন শিক্ষার লক্ষ্য আদর্শ জীবন সৃষ্টি হলেও, সেই আদর্শ জীবন কখনই সম্পূর্ণ রূপে বস্তু নির্ভর নয় বা তা কোনো আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে আদর্শ জীবন রচনা করা।

সর্বোপরি একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি স্বাধীন এবং সম্পর্কিত সত্তা।

এক্ষেত্রে বিশেষত রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্বই মূল আলোচ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বোধের শিক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশে একজন ছাত্রের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের কথা বলেছেন। আর কৃষ্ণমূর্তি প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা একজন ছাত্রের মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) দিকগুলির বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে হিংসাত্মক সমাজের রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছেন।

একথা বলা বাহুল্য যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে তথ্যনির্ভর এবং জীবিকাকেন্দ্রিক। এই প্রকার যান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ সমাজের মূল্যবোধকে ভুলতে বসেছে। ফলে দেশে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতিভিত্তিক বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। এখন যান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে বসবাস করাই হল মানব জীবনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এর ফলে অধিকাংশ মানুষ ভীষণ রকমের উচ্চাকাঙ্খী, স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। উচ্চাকাঙ্খার ফলে সমাজে প্রত্যেকেই বিখ্যাত হতে চাইছে। এর দ্বারা ভয় ও দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হচ্ছে। যা মানুষে মানুষে বিভাজন সৃষ্টি করছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে লড়াই করছে, মানুষ জীবনের প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ কি শুধুই তাই? বোধহয় না।

মনে হয় দেশের এই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ সঠিক শিক্ষা পদ্ধতির অভাব, শিক্ষা তথা জীবনের মূল লক্ষ্য নির্ণয়ের অভাব। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব এইপ্রকার সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও আমাদের মুক্তি দিতে পারে। তাই প্রশ্ন হল কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্বে উল্লেখিত মনস্তাত্বিক বিকাশের দিকগুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে একজন শিশু সাবলীলভাবে রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্বে উল্লেখিত বোধের শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় কিনা? সেটি দেখা দরকার। যার দ্বারা শিশুর আত্মোপলব্ধি হবে, জগতের প্রতিটি মূল্যবোধকে সে উপলব্ধি করবে এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করবে। আত্মার পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার পথটি সহজতর হবে। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ছোট আমি বড়ো আমিতে উত্তীর্ণ হবে।

প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্র উদ্বৃত্ততত্ত্ব (Surplus Theory) আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে যে বিশ্বরূপের কথা বলেছেন তার মধ্যে উদ্বৃত্তের আভাস রয়েছে।মানব সত্যের পূর্নতা উপলব্ধি করতে হলে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যে উদ্বৃত্ত রয়েছে তার জ্ঞান প্রয়োজন। বিবর্তনের ধারায় লক্ষ্য করা যায় মানুষ কেবলমাত্র আত্মসংরক্ষণেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি । উদ্বৃত্তের সৃজনী শক্তি দ্বারা মানুষ অসীমের সন্ধান করে । অনন্তকে জানতে চায়। যুগ যুগ ধরে মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছে। এর দ্বারা সে নিজেকেই প্রকাশ করেছে। আর এই আত্মপ্রকাশ ক্রমশ এক বৃহৎ সামঞ্জস্য (Harmony) লাভের প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের মতে, আত্মবোধ থেকে বিশ্ববোধে, স্বার্থ থেকে পরমার্থে উন্নীত হওয়াই মানুষের ধর্ম। আর মানুষের অন্তর্নিহিত

সৃজনী শক্তির উদ্বৃত্তই এই প্রকার প্রবণতার কারণ। তাই মানুষ সৃষ্টিশীল হয়। ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তাকে উপলব্ধি করে আনন্দ লাভ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন আলোচনা করা হয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই জানি রবীন্দ্রনাথ উপনিষদীয় চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাই রবীন্দ্রদর্শনে উপনিষদের প্রভাব স্পষ্ট। তাছাড়া দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে একজন ভাববাদী (Idealist) হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন সৃষ্টির মূলে আছে এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তি, যা সকল সৃষ্টির মধ্যে সতত বিকাশমান। মানবাত্মায়, মানবসমাজে সর্বত্রই এই শক্তির বিকাশ বিরাজমান। তিনি একে বলেছেন বিশ্বচেতনা, যা পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মাধ্যমে লাভ করা যায়। আর শিক্ষা এইরূপ আত্মবিকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে জীবন থেকে পৃথক করে দেখেননি। তাঁর মতে, শিক্ষার জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্য শিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন মূলত তৎকালীন ঔপনিবেশিক গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একপ্রকার প্রতিবাদ। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা হল তাই যা কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশনই করেনা, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সমঞ্জস্য রেখে মানুষের জীবনকে গড়ে তোলে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়, যথাযথ মানুষ তৈরী করে। এপ্রসঙ্গে তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য, গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি, আশ্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষার পরিবেশ, পাঠ্যক্রম, শিক্ষকের ভূমিকা, নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে

আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা যে আমাদের সত্তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারন রূপে তিনি ইংরাজি ভাষার শিক্ষাকে বিশেষত দায়ী করেছেন। তাই শিশুর প্রাথমিক ভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন- যা উক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শন আলোচনা করা হয়েছে। কৃষ্ণমূর্তির মতে শিক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষায় পাশ করে, জীবিকা অর্জন করে সুনিশ্চিত রূপে বসবাস করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য নয়। জীবিকা অর্জন জীবনে অবশ্যই জরুরী কিন্তু শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা হলে জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে হয়। তাই ছাত্রদের নিজেদেরই প্রশ্নটি করা উচিত কেন তারা শিক্ষিত হতে চাইছে? এই তথাকথিত শিক্ষার অর্থ কি? তথা জীবনের অর্থ কি? তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষার অর্থ কখনোই ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা কিংবা অন্যকোনো বিষয় থেকে তথ্য আহরণ করা নয় বরং তা সত্য না মিথ্যা সেটি বিচার করা এবং সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে শেখা বিশেষভাবে দরকার। তাঁর মতে, যান্ত্রিক শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে একজন ছাত্র একইসঙ্গে উচ্চাকাঙ্খী, ঈর্ষাপরায়ণ ও হতাশাগ্রস্থ হয়। উচ্চাকাঙ্খা থেকে ভয়ের উৎপত্তি হয় - পরীক্ষায় পাশ করবার ভয়, পিতামাতা কে ভয়, চাকরি হারানোর ভয়, মৃত্যুকে ভয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই ভয় থেকেই দ্বন্দ্ব (conflict)-এর সৃষ্টি হয় যা বিভেদের উৎপত্তি ঘটায়। এখন প্রশ্ন হল ভয় শূন্য মন নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারা জগতে বসবাস করা যায় কিনা? তাঁর মতে একজন শিশু স্বয়ং তার পূর্ব প্রথাগুলি থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করতে পারে, যেখানে একজন শিক্ষিত

ব্যক্তি সংস্কারমুক্ত, সংবেদনশীল, স্বাধীন এবং বুদ্ধিসম্মত জ্ঞান নিয়ে নির্ভয়ে জগতে বসবাস করতে সক্ষম।

কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য এবং একটি শিশুর প্রতি তার পিতামাতার ভূমিকা ঠিক কিরকম হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া একটি শিশুর মন কিভাবে শর্ত (condition) মুক্ত এবং ভয় (fear) মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা (Freedom) লাভ করবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এক্ষেত্রে জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকাটি বিশেষ দরকার। কারণ বুদ্ধিসম্মত জ্ঞান (knowledge with Intelligence)-ই সমাজের জন্য মঙ্গলময় হবে। তাই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে একজন ছাত্রকে প্রথমে নিজেকে শর্তমুক্ত হতে হবে। একজন হিন্দু, মুসলিম বা একজন ক্যাথলিক্ হিসাবে কখনই নয়। কারন পূর্ব শর্তের ফলাফলগুলি মানুষে মানুষে বিভাজন সৃষ্টি করে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এঁরা দুজনেই আদর্শ শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করতে চেয়েছেন। তাহলে পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? যদিও তাঁদের মধ্যে অতিসূক্ষ বৈসাদৃশ্য রয়েছে এবং তা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কৃষ্ণমূর্তি যেহেতু কোনো আদর্শ ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হন নি তাই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে কোনো ভাবধারার প্রভাব

পরিলক্ষিত হয় নি। যদিও আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ উপনিষদীয় চিন্তাধারার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং তার প্রভাব তাঁর জীবনদর্শন এবং শিক্ষাদর্শনে স্পষ্ট। তাছাড়া শিক্ষাবিষয়ে তাঁর ভাবনার সাথে পাশ্চাত্য ভাববাদী (idealist) শিক্ষাদার্শনিকদের ভাবনার অনেকাংশে মিল রয়েছে এবং তা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। তবে মূলত সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্বে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির বিকাশের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যা রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্বে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হয়নি। যদিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিশুমনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শিশুমনকে কখনোই উপেক্ষা করেননি। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রশিক্ষাতত্ত্বে কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্বে উল্লেখিত মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) বিকাশের দিকগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করলে বোধহয় রবীন্দ্রাশিক্ষাতত্ত্ব আরও বলিষ্ঠ হয়।

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্র উদ্বৃত্ত তত্ত্ব

আমরা প্রায় প্রত্যেকেই এ বিষয়ে অবগত যে, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন সৃষ্টির মূলে আছে এক সত্য। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে এক সত্যের বোধ অর্জন করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র এই সত্যের বোধ অর্জন করাই নয়, তা অর্জন করে জগতে কর্মের মাধ্যমে সেই সত্য হয়ে ওঠাতেই জীবনের পূর্ণতা। জগৎকে আংশিকরূপে জেনে এবং আপন সত্য থেকে দূরে অবস্থান করে জীবনের আংশিক সত্যকে পূর্ণ সত্য রূপে দাবী করা যায় না। তাই মানব সত্যের পূর্ণতা উপলব্ধ করতে হলে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যে উদ্বৃত্ত আছে তার জ্ঞান প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে যে বিশ্বরূপের কথা বলেছেন তার মধ্যে উদ্বৃত্তের আভাস রয়েছে। উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তির দ্বারা মানুষ অসীমের সন্ধান করে। উদ্বৃত্তের শক্তি দ্বারাই মানুষের ইচ্ছা ও ভাবনা ছাপিয়ে যায় তৎকালীন দেশ-কালের সীমানা। মানবদেহ যে শুধুমাত্র মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, হৃদয়-এর ধারনকারী নয় সেকথা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন :-

“Our living body has its vital organs that are important in maintaining its efficiency, but this body is not a mere convenient

sac for the purpose of holding stomach, heart, lungs and brains; it is an image – its higher value is in the fact that is communicates its personality. It has colour, shape and movement, most of which belong to the superfluous, that are needed only for self-expression and not for self-preservation."[১]

যুগ যুগ ধরে মানুষ আপন ব্যক্তিত্ব প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছে। আর এই সাধনায় মানুষ নিজেকেই প্রকাশ করেছে। এই আত্মপ্রকাশ এক ক্রমশ বৃহৎ সামঞ্জস্য (Harmony) লাভের প্রচেষ্টা। মানুষ নিজস্ব কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে অর্ন্তনিহিত সৃজনীশক্তির সামঞ্জস্য (Harmony) লাভ করে এবং সেই সমঞ্জস্যসৃষ্ট ধারনার দ্বারা অন্য মানুষ, জগৎ এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে, আত্মবোধ থেকে বিশ্ববোধে, স্বার্থ থেকে পরমার্থে উত্তীর্ণ হওয়াই মানুষের ধর্ম। মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির উদ্বৃত্তই এই প্রকার প্রবণতার কারন। এর দ্বারা মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে। মানুষ যেন উদ্বৃত্তের পরী।

মানুষের রুপ, চারিত্রিক মহিমা, সংগীত, সাহিত্য, নৃত্যকলা, শিল্পকলা, দর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে যে উৎকর্ষের প্রকাশ ঘটে তা বারবার প্রমান করে, মানুষের অন্তর অসীম অনন্ত সত্তার সন্ধান করে। মানবজীবনে উদ্বৃত্তের স্বরূপটি হল তাই, যা তাকে

[১] Tagore, Rabindranath, Ghosh, Sisir Kumar (ed.), Angel of Surplus, Visva Bharati, 2010, p.36.

তৎকালীন অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। তাই মানুষ সৃষ্টিশীল হয়। সৃষ্টির মাধ্যমে উপলব্ধি করে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয় তার সত্য পরিচয় নয়, বিশ্বগত আত্মপরিচয় তার সত্য পরিচয়। এই বিশ্বগত আত্ম-পরিচয়ের আকুলতা আসে মানুষের অন্তরের উদ্বৃত্ত থেকে।

মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে কর্মগুলি করে, তার প্রেরণা এসেছে আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার তাগিদ থেকে। নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা থেকে সে অনন্তকে জানতে চায়। এই আকাঙ্খার চরিতার্থতা লাভের উদ্দেশ্যেই মানুষ সৃজনশীল কর্ম করে। আপন সীমা পার করে আনন্দ লাভ করে। যা তার প্রেমে, সৌন্দর্য্যে ও মহত্ত্বে বিদ্যমান।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "This crossing of the limit produces joy, the joy that we have in beauty, in love, in greatness. Self-forgetting, and, in a higher degree self- sacrifice, is our acknowledgement of this our experience of the infinite. This is the philosophy which explains our joy in all arts, ..."[২]

মানুষ বিশ্বাস করে যে, আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য। অহংসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অসত্য। নিজ আত্মার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে মানুষ আনন্দ লাভ করে। নিজেকে প্রকাশ করে আনন্দ লাভ করে।

---

[২] Ibid, p.37.

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিজেকে না জানাকে এক প্রকার বন্ধন বলেই মনে করতেন -

"আপনারে জানে না যে,
সেই তার হয়েছে বন্ধন।"[৩]

মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য :

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিবর্তনের ধারায় মনুষ্য জগৎ পশুর জগৎ থেকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক রূপ নিয়েছে। মানুষ চতুস্পদী ভঙ্গিমায় জীবন পরিত্যাগ করে দু পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছে। বিবর্তনের ধারায় ব্যতিক্রম ঘটায় মানুষ। মানুষ দৈহিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়েছে। পশুর মতো চারপায়ে নিচের দিকে ঝুঁকে জগৎকে দেখার চিরাচরিত নিয়মটি মেনে নেয় নি।

মানুষ তার প্রয়োজনের উর্দ্ধে কর্ম করতে চেয়েছে। পশু এবং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি হল - পশু তার নিত্য প্রয়োজনের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ, কিন্তু মানুষ নয়।

---

[৩] Tagore, Rabindranath, Chitralipi 1, Visva Bharati, 2008, p.20.

তাই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন,

"The most important distinction between the animal and man is this, that the animal is very nearly bound within the limits of its necessities, the greater part of its activities being necessary for its self-preservation and the preservation of race."[৪]

মানুষ শুধুমাত্র প্রয়োজনের সীমাতেই আত্মসংরক্ষণ (Self preservation) করেনি। প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে সে আকাশকে দেখেছে, শিল্প (Art) সৃষ্টি (creation) করেছে তার উদ্বৃত্তের (surplus) কারনে। "The animals must have knowledge, so that their knowledge can be employed for useful purposes of their life. But there they stop."[৫] অর্থাৎ জীবন ধারনের জ্ঞান পশুর মধ্যে থাকতে হয়, কিন্তু পশু সেখানেই থেমে যায়। এর অতিরিক্ত জগৎকে জানতে সে চেষ্টা করেনি কখনও।

অনুরূপভাবেই প্রশ্ন ওঠে, জীবনধারনের সাধারণ জ্ঞান কী তাহলে মানুষের জন্য আবশ্যক নয়? উত্তরে বলা যায় মানুষকেও বাঁচতে হয়। তাই জীবনধারনের সাধারণ জ্ঞান মানুষেরও নিশ্চিতরূপে আবশ্যক। কিন্তু মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত একটা

[৪] Tagore, Rabindranath, Personality, Rupa Publicaitons, 2019, p.7.

[৫] Tagore, Rabindranath, On Art and Aesthetics A Selection of Lectures, Essays and Letters, Subarnarekha, 2005, p.13

সৃজনী (creative) শক্তি (energy) থাকে যেটা তাকে আত্ম-সংরক্ষণে (self-preservation) সীমাবদ্ধ রাখে না।

রবীন্দ্রমতে, "For man, as well as for animals, it is necessary to give expression to fillings of pleasure and displeasure, fear, anger and love. In animals these imotional expressions have gone little beyond their bounds of usefulness. But in man, though they still have roots in their original purposes, they have spread their branches far and wide in the infinite sky high above their soil. Man has a fund of emotional energy which is not all occupied with his self-preservation. This surplus seeks its outlet in the creation of Art, for man's civilization is built upon his surplus."[৬]

অর্থাৎ পশু নিত্য আশুপ্রয়োজনের মধ্যেই সীমিত থাকে। কিন্তু মনুষ্যজাতি ব্যবহারিক নিত্য আশুপ্রয়োজনের মধ্যে সীমিত থাকে না। মানুষ তার অনুভব (emotional) শক্তি (energy) দ্বারা অনন্তের সন্ধান করে। মনুষ্য জাতি তার আপন জগৎ সৃষ্টি করে তার উদ্বৃত্তের কারনে।

[৬] Tagore, Rabindranath, Personality, Rupa Publicaitons, 2019, p.8.

পশু তার প্রয়োজন ও আপন উপস্থিতিটুকু কেন্দ্র করে বাঁচে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সেই প্রয়োজনকে পেরিয়ে এক সত্য রয়েছে আদর্শরূপে; যা নিত্য প্রয়োজনের আদর্শ নয়। এই আদর্শ তাকে পূর্ণতা দেয় এবং সে অনন্তকে লাভ করে। সেখানে সে সত্য (True)। তখন ব্যক্তিগত সত্তাকে ছাপিয়ে সে বিশ্বমানবের (Universal Man) সন্ধান পায়, নিজেকে জানতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "Man is true where he feels his infinity, where he is devine, and the devine is the creator in him."[৭]

চেতনার তিনটি স্তর :

মানুষ তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে মুক্ত নিয়মের ভঙ্গিমায়। শুরুর থেকেই তার দুপায়ের উপর ভর করে দাঁড়ানোর ঘটনাটিকে প্রকৃতির পুরোপুরি বাধ্য না হওয়ার ইঙ্গিত রূপে গন্য করা যেতে পারে। জন্তু নিচের দিকে ঝুঁকে দেখেছে খন্ড খন্ড বস্তুকে। আর মানুষ উপরে মাথা তুলে যা দেখলো তা কেবলমাত্র বস্তু নয়, দৃশ্য, বিচিত্র বস্তুর মধ্যে ঐক্য। মানুষ নিজেকে জানলো সম্পূর্ণরূপে। নিজের সঙ্গে জাগতিক সকল বস্তুর ঐক্য অনুভব করলো এবং তা কখনই নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়।

[৭] Tagore, Rabindranath, Ghosh, Sisir Kumar (ed.), Angel of Surplus, Visva Bharati, 2010, p.71.

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :- "The highest purpose of this world is not merely living in it, knowing it and making use of it, but realising our own selves in it through expansion of sympathy; not alienating ourselves from it and dominating it, but comprehending and uniting it with ourselves in perfect union."[৮]

চেতনার দ্বিতীয়স্তর থেকে সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত হওয়া আদতে ঐক্যের একরকম রূপান্তর ঘটায়। দ্বিতীয় স্তরের মানুষ এবং প্রকৃতি যুক্তি দ্বারাই ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু সর্ব্বোচ্চস্তরে মানুষ প্রেম ও অনুভব দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। মানুষ তখন জগতকে খন্ডিতরূপে নয়, সমগ্ররূপে জানতে চায়।

সে নিজেকে প্রকৃতিরই একটি অংশরূপে অনুভব করে, কারন সে সম্পর্কীত সত্তা। তখন অসীমের দিকে মানুষের মন প্রবৃত্ত হয় এবং কল্পনাবৃত্তির সাহায্যে মানুষ অসীমকে জানতে চায়, নিজের মধ্যেই অসীমকে উপলব্ধি করতে চায়, প্রকাশ করতে চায়। যা রবীন্দ্রনাথের গানেও স্পষ্ট ----

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর –
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।।"[৯]

---

[৮] Tagore, Rabindranath, Creative Unity, The Macmillan Company Of India Limtied, 1980, p.49.

[৯] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৪২৭, পৃ.৩২।

রবীন্দ্রনাথ তার মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে বলেছেন "মানুষের দেহে শুদ্রের পদোন্নতি হল ক্ষাত্রধর্মে, পেল সে হাতের গৌরব, তখন মনের সঙ্গে হল তার মৈত্রী। মানুষের কল্পনাবৃত্তি হাতকে পেয়ে বসলো। দেহের জরুরী কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। জীবন যাত্রার কর্মব্যবস্থায় সে whole-time কর্মচারী রইল না। সে লাগলো অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্তপূর্বের রচনায় - অনেকটাই অনাবশ্যক। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নবস্কের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রস্কের, আনন্দব্রস্কের রাজ্য।" [১০]

নতুন জগতে প্রবেশ করে মানুষ তার কল্পনা দিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে জগৎ রচনা করে। কারন মানুষ আছে মুলত দুটি ভাব নিয়ে। একটি জীবভাব, যেটি আমাদের অবগত। দ্বিতীয়টি হল বিশ্বভাব। তাই প্রাথমিক স্তরে মানুষ তার স্বার্থসত্তার সমস্ত বস্তুকে নিজের কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষন করলেও দ্বিতীয়স্তরে সে তার উর্দ্ধে। এই স্তরে মানুষ সৃজনশীল। এই স্তরে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে। মানুষের জীবন অধ্যায়েই এই সৃজনশীলতার উদ্যমটি আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের এই নবসৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় সে তার প্রয়োজন অতিরিক্ত কর্ম করে থাকে। তাই বর্তমানে তার মধ্যে যা রয়েছে শুধুই তার মধ্যে জীবনধারন তার কাছে অর্থহীন। কারন তা সীমিত। মানুষ তা নিয়ে তৃপ্ত নয়। সে সৃষ্টিশীল, কারন সৃষ্টিই মুক্তি।

---

[১০] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মানুষের ধর্ম, বিশ্বভারতী, ১৪১৮, পৃ.১৬।

মানুষ তখন জগৎকে বিশ্বজগৎরূপে দেখতে উদ্যত হয়। প্রকৃতির এক ব্যবহার নিয়মকে অপরিহার্য বলে মেনে নেয় নি। সে কল্পনা দিয়ে স্বাধীন হতে চেয়েছে। মানুষ সেখানে ঐক্যবদ্ধ, মুক্ত এবং একজন সম্পর্কীত সত্তা। আপন কল্পনা দিয়ে সে মুক্তি, পূর্ণতা ও আনন্দ লাভ করতে চেয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আনন্দ লাভ না হলে তার আত্মা তার কাছে অর্থহীন যন্ত্রনামাত্র। তাই বলা যায় মানবদেহ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেছে, মুক্তি লাভ করেছে। তার নব সৃষ্টি সত্তা ছাপিয়ে গিয়েছে তার শরীর অতিরিক্ত বর্তমান ব্যবহারিক চাহিদাভিত্তিক জীবনকে। কারন সেখানে মন যোগদান করেছে। মনের উপস্থিতি এক বিরাট পরিবর্তন ঘটায় মনুষ্য জীবনে। তার সমস্ত চাহিদাগুলি ওলট-পালট হয়ে যায় মনের উপস্থিতিতে। তারপর সে তার মন অতিরিক্ত কিছুর সন্ধান করে। নতুন কিছু প্রকাশ করে যা তার মধ্যে ছিলনা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "What is it in man that asserts its immortality in spite of the obvious fact of death? It is not his physical body or his mental organization. It is that deeper unity, that ultimate mystery in him, which, from the centre of his world, radiates its circumference; which is in his body, yet transcends the body, which is in his mind, yet grows beyond his mind; which, through the things belonging to him, express something that is not in them;

which, while occupying his present, overflows its banks of the past and the future."[১১]

তিনি আরও বলেছেন – "It is the personality of man, conscious of its inexhaustible abundance, it has the paradox in it that it is more than itself. And this consciousness of the infinite, in the personal man, ever strives to make its expressions immortal and to make the whole world its own."[১২] অর্থাৎ অনন্তের প্রতি এই চেতনাটির দ্বারাই ব্যক্তি বিশ্বজগৎকে আপন করে নেয়।

‘ছোট আমি’ ও ‘বড় আমি’ :

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের ইতিহাস হল তার ‘ছোট আমি’ থেকে ‘বড় আমি’ তে উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে একপ্রকার অগ্রগতির ইতিহাস। মানুষ অনন্তকাল ধরে তার 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি’-র সত্য প্রতিষ্ঠায় রত হয়েছে। মানবিক চেতনার দুটি স্তরে আমরা লক্ষ্য করেছি মানুষ সক্রিয় রূপে সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে যুক্ত এবং সে সৃজনশীল। সে নিজেকেই প্রকাশে রত। সে তার শিল্পসত্তা দিয়ে সৃষ্টি করতে চায় উপভোগ করতে চায় সৌন্দর্যকে।

---

[১১] Tagore, Rabindranath, Ghosh, Sisir Kumar (ed.), Angel of Surplus, Viswa Bharati, 2010, p. 72.
[১২] Ibid, p.73.

উন্নত চেতনস্তর হল মানুষের সৃষ্টিশীল চেতনার স্তর। এই স্তরে মানুষের ছোট আমি বা নিম্নতর আত্মার প্রয়োজনগুলি সর্বদা পূরণ হয় না। কারন তা মানুষের বড় 'আমি'-র চেতনার প্রতি ঐক্যতার আবেদন জানায়। তখন মানুষের 'ছোট আমি' 'বড় আমি'-র দিকে উত্তীর্ণ হয়। অর্থাৎ আমার আমি মহা আমিতে উত্তীর্ণ হয়ে সার্থকতা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে, আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা-আমিতেই সার্থক। এইজন্য সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম আমিকেই খুঁজছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা রাণু অধিকারীকে একটি চিঠিতে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় --

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

..... আমাদেরও তেমন এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখ দু:খ ভালবাসাকে চিরজীবনের চলবার পথে চিরজীবনের দেবতাকে উৎসর্গ করতে করতে যেতে হবে - তা হলেই ছোট আমির সঙ্গে বড় আমির মিল হবে - তাহলেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হবে। আপনার দিকে সমস্ত টানতে গেলেই সে টান টেঁকে না, সে বিদ্রোহে ছোট-আমিকে একদিন পরাস্ত হতেই হয়। এই জন্য ছোট-আমি জোড়ে [য] হাতে প্রার্থনা করচে, নমস্তেহস্ত - বড়কে আমার নমস্কার সত্য হোক্, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই। ইতি ২৯ ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা[১৩]

[১৩] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (অষ্টাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২০, পৃ.৭৬।

‘ছোট আমি’ হল ক্ষুদ্র, স্বার্থসংকীর্ণ, নিজের মধ্যেই সীমিত। আমাদের প্রাত্যহিক অহংবোধকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ছোট আমি’। তাঁর মতে, 'ছোট আমি' হল অহংকেন্দ্রিক। তাই এটি হল বিশেষ। তিনি বলেছেন এই 'ছোট আমি' কে ‘বড় আমি’ হয়ে উঠতে হবে। আর এই ক্রমশ ‘হয়ে ওঠা’ বা বৃহৎ এর দিকে অগ্রসর হওয়াটাই মানবজীবনের পরমলক্ষ্য। আমি তে সীমাবদ্ধ থাকাতে কোনোরকম সার্থকতা নেই। তাই Being বা অস্তিত্ব নয়, Becoming বা ‘হয়ে ওঠা’-র চেষ্টাতেই সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ ‘ছোট আমি' ও 'বড় আমি’কে স্বতন্ত্র করেছেন। 'ছোট আমি' কে তিনি self বলেছেন -

"The self that is unyielding and narrow, that reflects no light, that is blind to the infinite."[১৪] অর্থাৎ self হল ক্ষুদ্র এবং অসীম থেকে বিচ্যুত। অন্যদিকে ‘বড় আমি'কে তিনি soul বলেছেন- "It is only the soul, the one in man which by its very nature can overcome all limits, and finds its affinity with the supreme one."[১৫] অর্থাৎ soul স্বভাবতই সকল সীমাকে অতিক্রম করে, অসীমের সঙ্গে যুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের প্রকৃতিই হল ছোট আমি থেকে বড় আমির দিকে অগ্রসর হওয়া। ‘বড় আমি' এবং 'ছোট আমি' র মধ্যে তফাৎটি হল 'বড় আমি’ পরমসত্ত্বা। সর্বদা তিনি পূর্ণ হয়ে আছেন। অন্যদিকে ছোট আমি-কে সর্বদা পরিপূর্ণ

---

[১৪] Tagore, Rabindranath, Sadhana, Rupa Co., 2005, p.33.

[১৫] Ibid, p. 37.

হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। 'ছোট আমি' কি পাব, কি পায়নি তাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই পাওয়া অতিরিক্ত 'হয়ে ওঠা'-তেই পরম সার্থকতা বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলেছেন -- "আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোটো, আর-একদিকে অত্যন্ত বড়। যে দিকটাতে আমি কেবলমাত্রই আমি - সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি - কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা - সে দিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই-যে দিকটাতে আমি তো একটি বিন্দুমাত্র, সে দিকটাতে আমার মত ছোটো আর কে আছে! আর, যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মান্ডের পরিপূর্ণতা - যে দিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শতসহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ীর সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে, আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোকলোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে 'তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর কেউ নেই- অন্তরের মধ্যে তুমি কেবল তুমি', সেইখানে আমার চেয়ে বড়ো আর কে আছে।"[১৬] – আর এখানেই আমার সার্থকতা।

বড় আমি হল 'পরমাত্মা' আর ছোট আমি হল 'অহং'। এই 'অহং' তার স্বার্থকে অস্বীকার করতে পারে না। নিজ বিষয়ে সে সদা চিন্তিত। কারণ –

"All our egoistic impulses, our selfish desires, obscure our true vision of our soul. For they only indicate our own narrow self. When

[১৬] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৩, পৃ.৩৫২।

we are conscious of our soul, we perceive the inner being that transcends our ego and has it's deeper affinity with the all."[১৭] অর্থাৎ আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতাগুলি আত্মার প্রকৃত রূপটিকে ঢেকে দেয়। কিন্তু যখন আমরা আমাদের আত্মা সম্পর্কে সচেতন থাকি, তখন আত্মকেন্দ্রিকতা ক্রমশ অস্পষ্ট হতে থাকে এবং তখন সকলের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে সম্পর্কীত হয়ে থাকি। তাই বড় আমি হল বৃহৎ, স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত এবং অসীমের সঙ্গে যুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ‘বড় আমি' ও 'ছোট আমি’র প্রসঙ্গে আরও বলেছেন- "At one pole of my being I am one with stocks and stones. There I have to acknowledge the rule of Universe law.”[১৮] অন্যদিকে তিনি বলেন - "But at the other pole of my being I am separate from all. There I have broken through the cordon of equality and stand alone as an individual. I am absolutely unique, I am I, I am incomparable. The whole weight of the universe cannot crush out this individuality of mine. I maintain it in spite of the tremendous gravitation of all things. It is small in appearance but great in reality."[১৯] অর্থাৎ যখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তার চিন্তায় মগ্ন থাকি, তখন আমাদের অহংবোধ জাগ্রত

[১৭] Tagore, Rabindranath, Sadhana, Rupa Co., 2005, p.23.

[১৮] Ibid, p. 57.

[১৯] Ibid, p. 57.

হয় এবং সকলের থেকে নিজেকে পৃথক মনে করি। আপন সংকীর্ণ স্বার্থসত্তার চিন্তায় সদা ব্যস্ত থাকি।

কিন্তু যখন মানুষের ‘বড় আমি’ সংকীর্ণ অহংবোধকে ত্যাগ করে, সকলের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যস্থাপন করে, তখন ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তাকে উপলব্ধি করে। পরমসত্যকে উপলব্ধি করে পরম আনন্দ লাভ করে। সাধনায় তিনি শিশুদের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সুস্পষ্ট করেন - "Children, when they begin to learn each separate letter of the alphabet, find no pleasure in it, because they miss the real purpose of the lesson; They become a source of joy to us only when they combine into words and sentences and convey an idea. Likewise our soul when detached and imprisoned within the narrow limits of a self loses it's significance. For its very essence is unity. It can only find out it's truth by unifying itself with others, and only then it has its joy.”[২০]

অর্থাৎ একটি শিশু যখন একটি অক্ষর প্রথম শেখে তখন সেটিতে কোনোরূপ আনন্দ হয়না। কিন্তু যখন শিশুটি কতকগুলি শব্দকে মিলিত করে একটি বাক্য তৈরী করে - তখন সেটি আমাদের আনন্দের উৎসের কারণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবেই ‘ছোট আমি’ যখন তার সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে ‘বড় আমি'তে উত্তীর্ণ হয় তখন

---

[২০] Ibid, p. 23.

সকলের সঙ্গে ঐক্যলাভ করে আনন্দ অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন - "It very often happens that our love for our children, our friends, or other loved ones, debars us from the further realization of our soul. It enlarges our scope of consciousness, no doubt, yet it sets a limit to its freest expansion. Nevertheless it is the first step, and all the wonder lies in this first step itself. It shows to us the true nature of our soul. From it we know, for certain, that our highest joy is in the losing of our egoistic self and in the uniting with others."[২১]

এরূপে 'ছোট আমি' তার ক্ষুদ্র স্বার্থসত্তা পরিত্যাগ করে আত্মার প্রকৃত স্বরূপটিকে উপলব্ধি করে 'বড় আমি'তে পরম আনন্দ লাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে অস্তিত্বের দ্বৈতরূপ লক্ষ্য করা যায়। একই মানবের মধ্যে দুইটি আমি বিরাজ করে। একই ব্যক্তিতে 'ছোট আমি' ও 'বড় আমি' অবস্থান করে। অহং হল 'ছোট আমি' এবং 'বড় আমি' হল মানবাত্মা বা পরমাত্মা। 'ছোট আমি' আত্মকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রদর্শনের ন্যায় উপনিষদেও মানুষের দুটি সত্তার কথা বলা হয়েছে। তৈত্তেরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে –

'অহং বৃক্ষস্য বেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। উর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সর্বচসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্।।' ১।১০[২২]

[২১] Ibid, p. 25.

[২২] অবধূত, কালিকানন্দ (সম্পাদিত), উপনিষদ সমগ্র, গিরিজা লাইব্রেরী, ২০২১, পৃ.১৮৬।

অর্থাৎ সংসার একটা বড় গাছের মত। ত্রিশঙ্কু ঋষি আত্মজ্ঞান লাভ করে এই কথা বলেছিলেন। এছাড়াও তিনি বলেছিলেন, সংসার নামক বৃক্ষের আমিই উৎসাহদাতা বা কর্মপ্রবর্তক। পর্বত শিখরের ন্যায় উন্নত আমার কীর্তি। সূর্য সকলকে খাদ্য দেন এবং এর ফলে সবাই অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। সূর্য যেমন অমৃত, আমিও সেইরকম শোভন অমৃত। সূর্য সবকিছুর ঊর্দ্ধে এবং শুদ্ধ। আমিও মহান এবং শুদ্ধ কেননা, আমিও পরমব্রহ্ম। আমি দীপ্তিমান, ব্রহ্মারূপ ধন, আমি উত্তম মেধাসম্পন্ন, আমি অমৃত ও অক্ষয়। আমি আমার আত্মার মতই উজ্জ্বল, জ্যোতিসম্পন্ন। আমি ভয়হীন। মৃত্যুভয় আমাকে স্পর্শ করে না। আমি অপরিবর্তনীয়। এক্ষেত্রে অহংকে বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি'তে উত্তরণের মধ্যে দিয়ে বৃহৎ অর্থে অহং-এর মহত্তমরূপটি উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে উপনিষদের ন্যায় রবীন্দ্রদর্শনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - ''তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই - যে আমিত্ব ব'লে একটি জিনিস এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত-কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্ছি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মান্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিলচরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।''[২৩] কিন্তু যখন এই দুটি অংশকে আসলে একই সত্তার দুটি অভিব্যক্তি রূপে আবিষ্কার করা হয় তখন ঐক্যলাভ করে পরমসত্যে উপনীত হয়ে পরম আনন্দ লাভ করা যায়। এই সহানুভূতির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি

[২৩] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৩, পৃ.৩৫৩।

বিশেষ পরম সত্তায় নিজেকে উপলব্ধি করে ও বিশ্বের সমস্ত কিছুর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে। এই প্রকার ভালোবাসা সৃজনশীল।

এক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তা অন্যের সঙ্গে স্বতন্ত্র হলেও সকলেই সেই পরমসত্তার অংশ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম এবং হৃদয় বৃত্তির সমস্ত শক্তি দিয়ে মানব থেকে মহামানবে উত্তরণ সম্ভব হয়। তাই তিনি বলেছেন - "In its finite aspect the self is conscious of its separateness, and there it is ruthless in its attept to have more distinction than all others. But in its infinite aspect its wish is to gain that harmony which leads to its perfection and not its mere aggrandizement."[২৪] অর্থাৎ মানুষ যখন তার স্বার্থসিদ্ধিতে আবদ্ধ থাকে তখন অন্যের থেকে সে কেবলই নিজেকে পৃথক করে অহংকে স্বীকার করে। কিন্তু যখন সে তার অহং কে অতিক্রম করে তখন অন্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে। নিজের মধ্যে অন্যকে এবং অন্যের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে। তখন উপলব্ধি হয় ছোট আমি সত্য নয়। বড় আমিই সত্য ও তার সঙ্গে আমার চিরদিনের মিলন। তাই রবীন্দ্রনাথ রানু অধিকারীকে একটি পত্রে লেখেন -

---

[২৪] Tagore, Rabindranath, Sadhana, Rupa Co., 2005, p.71.

১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণু ..... মানুষ সেই রকম নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই যখন নিজে থাকে তখন তার কৃপণতার অন্ত থাকে না, তখন সে ঈর্ষায় দ্বেষে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। তখন সে নিজের সমস্ত কিছুকে নিজের মধ্যেই বেঁধে রাখবার জন্যেই রাত্রিদিন উৎকণ্ঠিত এবং উদগ্র হয়ে থাকে - তখনই সে চারদিককে কেবলি খোঁচা দিতে থাকে। কিন্তু যখনি সে জানে বড়র মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা, - এত বড়ই সে, যে, মৃত্যুর মধ্যেও তার অন্ত নেই; এত বড়ই সে, যে, সমস্ত দু:খ শোক ক্ষতিকে অতিক্রম করে অসীমের দিকে সে চলেচে এবং অসীমের মধ্যেই নিবিষ্ট হয়ে আছে; সেই অনন্তের মধ্যেই তার সমস্ত প্রেমের সমস্ত আনন্দের উৎস, - তখন সে আর আপনার এটা ওটা, আপনার ছোট ছোট তীক্ষ্ণ ইচ্ছা নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়ায় না - সে কাঙালের মত চাই চাই করে না তখন সে আপনাকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে ..... আপনাকে আপনার চিরন্তনের মধ্যে অনুভব করতে হবে; জানতে হবে, এই ছোট-আমি সত্য নয়; জানতে হবে আমি বড় এবং বড়র সঙ্গে আমার চিরদিনের মিলন, ...। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা[২৫]

[২৫] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (অষ্টাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২০, পৃ.৭৩।

রবীন্দ্রমননে বিশ্বানুভূতি :

এখন উদ্বৃত্ত প্রসঙ্গে বিশ্বানুভূতির অনুভব রবীন্দ্রমননে ঠিক কবে আসে সে বিষয়ে আমরা স্বল্পবিস্তর আলোচনা করবো।

রবীন্দ্রমননে এই আকাঙ্খার প্রথম সূত্রপাত হয় বোধহয়, তাঁর উপনয়নের সময়। ১৮৭৩ সালে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো বৎসর নয় মাস। ব্রাহ্মণমাত্রেই নতুন ব্রহ্মচারীকে উপনয়নের পর গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হয়। এই গায়ত্রী মন্ত্র যখন প্রথম উচ্চারণ করেন তিনি, তখন বিশ্বপ্রকৃতিকে অনুভব করার তাগিদ তাঁর প্রথম অনুভূত হয়। তিনি বলেছেন ''নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল।''[২৬] মন্ত্রজপের সময় তিনি গ্রহমণ্ডল সমেত আকাশের বিরাট রূপকে মনে আনতে চেষ্টা করতেন। বিশ্বানুভূতির চেষ্টা এই প্রথম। তাঁর বয়সের বালকের পক্ষে যতটুকু উপলব্ধি করা সম্ভব ততটুকুই তিনি করেছেন। গায়ত্রী মন্ত্রের তাৎপর্য উনি সে বয়সে যে সম্পূর্ণরূপে বুঝতেন, এমনটাও নয়। অর্থাৎ মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা সম্পূর্ণ না বুঝলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না।''[২৭]

আসলে আমাদের অন্তরে আকস্মাৎ এমন এক কাজ চলে বুদ্ধি সর্বদা তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। গায়ত্রী মন্ত্রের বিশেষ প্রভাব পড়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তিনি সাধনায় বলেছেন - "...the text of our everyday meditation is the Gayatri, a verse which is considered to be the epitome of all the Vedas. By its help we try to realise the essential unity of the world with the

---

[২৬] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী, ১৪২১, পৃ.৪৯।

[২৭] তদেব, পৃ.৫১।

conscious soul of man; we learn to perceive the unity held together by the one Eternal Spirit, whose power creates the earth; the sky, and the stars and at the same time irradiates our minds with the light of a consciousness that moves and exists in unbroken continuity with the outer world."[২৮] এ চেতনা বিশ্বচেতনা।

রবীন্দ্র মননে এই উপলব্ধি তীব্রতর হয় রবীন্দ্রনাথের ঠিক উপনয়নের পরেই শান্তিনিকেতন ভ্রমণে। শান্তিনিকেতনে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেলেন। প্রকৃতিকে অনুভব করলেন। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে অনুভব করলেন। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তি মানুষের মধ্যে শুরুর থেকেই থাকে, তবুও মানুষ অকস্মাৎ এর উৎক্ষেপন অনুভব করতে পারে এবং রবীন্দ্রজীবনেও বিষয়টি ভিন্ন নয়। এই আলোচ্য বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথের নিজ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। তাঁর এই অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, কবিতায় প্রকাশিত। তিনি তাঁর আত্মজীবনী, জীবনস্মৃতি এবং অনান্য বিভিন্ন রচনাতে এই কবিতার প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে যখন বসবাস করেন, তখন ভোরবেলায় তিনি এক অভূতপূর্ব অনুভূতি লাভ করতেন। ঝুলবারান্দা বেঁকে সূর্যকে গাছগুলির পিছন থেকে উঠতে দেখেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি অনুভব করেন তাঁর চোখের সামনে থেকে যেন একটি পর্দা সরিয়ে নেওয়া হল এবং তখন তিনি সকল বস্তুকে তরঙ্গের মধ্যে নৃত্যশীল কল্পনা করেছেন। অনুভূত হয় রবীন্দ্রমননে সৌন্দর্য। এই দৃষ্টি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়দৃষ্টি নয় তা কল্পনাদৃষ্টি এবং তা সম্পূর্ণরূপে চেতনার দ্বারা অনুভূত। এরূপচেতনা দ্বারাই বিশ্বপ্রকৃতিকে অনুভব করা যায়।

[২৮] Tagore, Rabindranath, Sadhana, Rupa Co., 2005, p.6.

আমাদের সভ্যতায় উদ্বৃত্তের প্রকাশ :

আমাদের সভ্যতায় (civilisation) বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে উদ্বৃত্তের পরী আসে ভিন্নরূপে। উদ্বৃত্তের প্রকাশ হয় যুগে যুগে।

রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেন "Moghal Delhi and Moghal Agra show their human personality in their buildings. Moghal emperors were men, they were not mere administrators. ... The memorials of their reigns do not persist in the ruins of factories and offices, but in immortal works of art - not only in great buildings, but in pictures and music and workmanship in stone and metal, in cotton and wool fabrics."[২৯]

ভারতবর্ষ, পারস্য, চীন কিংবা গ্রীসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি সত্যই তার মনুষ্য ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করেছে যুগে যুগে। একেই বলা যায় মানবজীবনের উদ্বৃত্ত যা চিরকালীনতার মর্যাদা লাভে ব্রতী। এই উদ্বৃত্ত দ্বারাই মানুষ সর্বকালীন ঐক্য প্রকাশে সমর্থ হয়।

---

[২৯] Tagore, Rabindranath, Personality, Rupa Publicatios, 2019, p. 15.

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন, "For the true Principle of art is the principle of Unity."[৩০]

তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উদ্বৃত্ত প্রদত্ত কর্মগুলির সঙ্গে মানুষের পার্থিব প্রয়োজনগুলির কোনরকম অসঙ্গতি নেই। সৃষ্ট বস্তুর রপান্তর সম্ভব। আর মানুষ নিজেই তার দৃষ্টান্ত। মানুষ নিজে তার রূপান্তর ঘটিয়েছে। আর এই রূপান্তরের পশ্চাতে রয়েছে মানুষের উদ্বৃত্ত যার দ্বারা সে শান্তি ও সামঞ্জস্য (Hermony) লাভ করেছে। উপলব্ধি করেছে সৌন্দর্যকে ও তার শিল্পী সত্তাকে।

প্রেরণার নিয়ন্ত্রন :

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যদি আমরা সৃষ্টির মাধ্যমে সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাই, তাহলে আমাদের কামনা ও প্রেরণা সমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করতে হবে বলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মনে করতেন। একজন শিল্পী অপরূপ সৃষ্টি প্রকাশ করতে পারেন, যখন তিনি নিজে আত্মশৃঙ্খলাপরায়ণ হন। এর অর্থ কখনই এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ কঠোর তপস্যার উপদেশ দিয়েছেন। মুক্তি কবিতায় তিনি এই বিষয়ে খুবই স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে তিনি কঠোর তপস্যাকে সমর্থন করেন নি। কঠোর তপস্যা বা অত্যধিক আত্মসংযম এইগুলি পরিত্যাগই শ্রেয়। তাঁর মতে, সৃজনশীল অভিব্যক্তির পরিপূর্ণ আকার

[৩০] Tagore, Rabindranath, Ghosh, Sisir Kumar (ed.), Angel Of Surplus, Viswa Bharati, 2010, p.65.

শিল্পীর ভারসাম্য যুক্ত চরিত্রই নির্দেশ করে। মানুষের গভীর চেতনাবোধই এক ঐক্য প্রদর্শন করে। এটি তখনই সম্ভব, যখন সৃষ্টির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি সঠিক পদ্ধতিতে মনোযোগ দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকগুলি (অচলায়তন, তাসের দেশ) তে, অত্যাধিক তপস্যা এবং নিয়মানুবর্তিতাকে উপহাস করা হয়েছে। তিনি অত্যাধিক তপস্যার বিরোধী ছিলেন। কারন মানুষ চেতনার ঐক্য লাভ করতে চায়। কিন্তু কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং বদ্ধ সংস্কার বর্তমান থাকলে চেতনার উচ্চতর স্তর থেকে নিম্নে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া কঠোর নিয়ন্ত্রণ সর্বদা পুনরাবৃত্তি এবং একঘেয়েমি দ্বারা যুক্ত থাকে – যা উদ্বৃত্তের সৃজনশীলতার বিরোধী। অতি প্রাচুর্য্য এর দর্শনকে বিঘ্নিত করে। কিন্তু একটি সুবিন্যস্ত অভিব্যক্তি, সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। অনুভূতি যুক্ত কর্ম শিল্পীর কামনাকে তৃপ্ত করে।

ছুটি প্রসঙ্গ :

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিল্প ও সৃজনশীলতা সমন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছুটি বা অবসরের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। এখন প্রশ্ন ওঠে, অবসর কী সৃজনশীলতার একটি কারন?

রবীন্দ্রনাথের মতে, উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তি একজন মানুষকে এবং তাঁর চিন্তা সমূহকে এক স্বাধীন উচ্চতায়, এক চেতনস্তরের পথনির্দেশ করে।

এইরূপ স্বাধীনতার অবস্থা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছুটি-র সঙ্গে বিষয়টি তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ কাজ-খেলা-সৃষ্টি ও ছুটির মধ্যে এক ধারাবাহিকতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন – "Joy without the play of joy is no joy at all -- play without activity is no play. Activitiy is the play of joy."[৩১] অর্থাৎ কাজের মধ্যে খেলাতেই আনন্দ। নির্ভেজাল ছুটি দেবতাদের জন্য । রবীন্দ্রনাথ নিজে পরীদের দেশের ছুটি আবিষ্কার করতে চান, কিন্তু এই জগতের নয়। যেখানে সপ্তাহের সব দিনগুলি ছুটির দিন, সেখানে ছুটির দিনের আদৌ প্রয়োজন হয়না। যেখানে সকল কাজের মধ্যে বিশ্রাম থাকে সেখানে সকল কর্তব্যই আনন্দ সহকারে অকর্তব্য বলে দেখা হয়। অবসর বলতে সাধারণত আমরা প্রয়োজন অতিরিক্ত সময়কেই বুঝে থাকি। আমরা যে অর্থে অবসরকে বুঝে থাকি রবীন্দ্রনাথ উক্ত শব্দটির ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'অবসর' শব্দটি সম্বন্ধে একটি অতিসূক্ষ্ম তারতম্য প্রদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, একজন ব্যক্তিকে তখনই সুখী বলা হবে, যখন তার অপরিব্যাপ্ত সময় দেখারও সুযোগ থাকে। তার সমৃদ্ধি হল মানসিক, কারন তিনি তার অবসরকে কাজে লাগাতে সক্ষম। তাঁর মতে, অবসরকে সৃষ্টির মধ্যে কাটাতে হবে এবং যে কাজ করা হবে তা কখনই আমাদের মনের উপর কঠোর চাপ সৃষ্টি করবে না।

---

[৩১] Tagore, Rabindranath, Sadhana, Rupa Co., 2005, p.113.

দেবতারা ছুটি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাটান আর মানুষও সৃষ্টিশীল বলে এইরূপ করে। রবীন্দ্রনাথ কাজ ও ছুটির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাঁর লিখিত নাটক শারদোৎসবে তিনি কাজের মধ্যেই ছুটিকে আবিস্কার করেছেন বালক উপনন্দর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে -

''সন্নাসী : .. বাছা, তুমি কী কাজ করছ? আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ : .... আজ ছুটির দিন। কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা : জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই?

উপনন্দ : ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন, তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী - সেই, ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

সন্ন্যাসী : ..... বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে! তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ। তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না।''[৩২]

অর্থাৎ অবসর সময় সৃষ্টির কাজ করলে সেটি হয় ছুটি। তাই কাজ হবে উপভোগ বা আনন্দ। তাঁর মতে, "Our day of work is not our day of joy -- for that we require a holiday; for, miserable that we are, we cannot find our

[৩২] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৮, পৃ.৩৭৯।

holiday in our work."[৩৩] অর্থাৎ আমাদের কাজের দিনগুলি আমাদের আনন্দের দিন নয়, যার জন্য আমরা আলাদা করে ছুটির দিন চাই। কিন্তু আমাদের কাজই আমাদের আনন্দ হলে আলাদা করে একটি ছুটির দিনের প্রয়োজন সত্যিই হয় না। তাই আমাদের কর্মগুলিকে বন্ধনমুক্ত হতে হবে। বন্ধনমুক্ত কর্মগুলি ছুটির দিন সৃষ্টি করে। তাই তখন আলাদা করে ছুটির দিন চাইতে হয় না।

উদ্বৃত্তের প্রয়োজনীয়তা :

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এই উদ্বৃত্তের প্রয়োজনীয়তা কী? বা তা থাকলেও ঠিক কতটা? সত্যিই উদ্বৃত্ত ছাড়া কী মনুষ্য জীবন অচল? - উত্তরে বলা যায়, যদি বলা হয় সঙ্গীত বা চিত্রকলায় কি লাভ হয় আদতে? চিত্রকলায় কী সার্বিকরূপে অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয়? উত্তরে বলা যায় না, হয়তো, সত্যিই হয় না। কিন্তু সৃষ্টির মূল্য কি শুধুই তার উপযোগীতায়? বোধহয় না। যদিও বর্তমান সমাজে দাড়িয়ে আমরা এমন অজস্র উদাহরন দেখতে পাই যাতে কিনা শিল্পকর্ম অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করে থাকে অনেক ক্ষেত্রেই, যদিও তা সংখ্যায় কম। কিন্তু সৃষ্টির মূল্য কখনই শুধুমাত্র জীবনযাত্রার উপযোগীতায় নয়, মানবাত্মার পরিপূর্ণ বিকাশে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন এটি কোনো দরকারের আদলে আসে না, আবার কথায় কথায় এটিই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এটি ছাপিয়ে যায় মানুষের প্রাণ পাত্রকে। এর দ্বারা মানুষ প্রকাশ করে তার আপন ব্যক্তিত্বকে - এতেই তার শ্রেষ্ঠতার পরিচয়।

---

[৩৩] Tagore, Rabindranath, Sadhana, Rupa Co., 2005, p.115.

এটি বাড়তি, উদ্বৃত্ত। রবীন্দ্রমতে, এই উদ্বৃত্ত মানুষের পূর্বপ্রদত্ত একটি গুণ। এটি এমন এক শক্তি, যা তার কল্পনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোনো মানুষই এর থেকে বঞ্চিত নয়। তবে সকলের মধ্যে এই উদ্বৃত্তের সচেতনতা ও প্রকাশ একপ্রকার নয়। উদ্বৃত্ত পর্যায়ক্রমে আসে কিনা সেটি নির্ভর করে একজন ব্যক্তির চেতন স্তরগুলির উপর। এর প্রকাশের নির্দিষ্ট কোনো ক্ষণ নেই। যে কোনো মানুষের মধ্যে এই উদ্বৃত্তের পরী (Angel) থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই উদ্বৃত্তের অপব্যবহারও লক্ষনীয় বর্তমান ও অতীত সমাজে। উদ্বৃত্তের অপব্যবহারের দ্বারা মানুষ ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করতে পারে সমাজে – যা রবীন্দ্রউদ্বৃত্ততত্ত্ব বিরোধী।

আপত্তি :

আমরা এখন পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম, সেই প্রসঙ্গটিতে কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তি পশুর মধ্যে স্বীকার করতে রাজী নন। কারন সে আপনাকে প্রকাশে ব্যর্থ। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, বিষয়টি কতটা যুক্তিযুক্ত? - কারন একজন মানুষের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তি স্বীকার করা হয়েছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই। কিন্তু যদি বলা হয়, মানুষের প্রকাশভঙ্গি স্পষ্ট আর পশুর অস্পষ্ট - তাহলে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে অসংগতি দৃষ্ট হয়, কারন পশুর উদ্বৃত্তের উপলব্ধি হয় কী হয় না, তা তার তীব্রতার উপরে নির্ভরশীল। তার প্রকাশ যদি দৃষ্ট না হয়, সেক্ষেত্রে একথা ধরে নেওয়ার কোনো কারন নেই যে পশু উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তির গন্ডীর বাইরে। তাছাড়া Animal Ethics অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে

অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। কারন এক্ষেত্রে পশুকে মানুষের ন্যায় গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা রবীন্দ্র উদ্বৃত্ত তত্ত্বে উহ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পশু উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তির বাইরে। তিনি মানুষকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, পশুকে নয়।

এছাড়া, আরেকটি প্রশ্ন ওঠে, রবীন্দ্রনাথের মতে, সৃষ্টির মূল্য জীবনযাত্রার উপযোগিতায় নয় মানবত্মার পূর্ণস্বরূপের বিকাশে। সত্যিই কি তাই? এক্ষেত্রে জীবনযাত্রার উপযোগিতার দিকটিকেও সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ তা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

আরও বলা যায়, কেউ কেউ বলতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের শিল্পী হল দেবত্বের দিকে অনুগামী। অতি সূক্ষ্ম আবেগ-সম্পন্ন একজন মানুষ। এই সমস্ত গুণ সম্পন্ন মানুষ, কখনই কোনো তত্ত্বাবধানের অধীনে কর্ম করতে পারে না। তার কর্মগুলি তার নিজস্ব স্বাধীনতা প্রকাশ করে কিছু বিধিনিষেধসহ।

এক্ষেত্রে বলা যায়, মানুষ কী একটি যন্ত্র যে, সে কঠিন নিয়মানুসারে কাজ করবে? মানুষের মন এতই বড় ও বিচিত্র, ও এর চাহিদা এত বিভিন্ন প্রকার যে - এটি একই বৃত্তে পাক খাবে? উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষকে মানবসুলভ তৈরী করে প্রমাণ করে যে, সে সৃষ্টিশীল। সে কেবল পদার্থের সমষ্টিমাত্র নয়। কঠোর নিয়মানুবর্ত্তীতা দ্বারা আবদ্ধ মানুষ, প্রকৃতপক্ষে জীবিত নয়। সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ ঐক্য লাভ করে, আনন্দ লাভ করে, কিন্তু পশু

ব্যবহারিক চাহিদাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষ সৃষ্টিশীল। আর এটি উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তির মধ্য দিয়েই সম্ভব, শুধুমাত্র ব্যবহারিক জীবনযাত্রার উপযোগিতা দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন

এখন আমরা মূলত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষা সম্পর্কীত রবীন্দ্র মনোভাব নিয়ে আলোচনা করবো। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা পূর্বে, একথা উল্লেখ করা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ মূলত একজন কবি। ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। ভারতীয় শিক্ষা রীতি তার থেকে বাদ পড়েনি। তাঁর শিক্ষাদর্শন শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি নিজেই তার বাস্তব প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন ভীষণভাবে বাস্তববাদী। দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে একজন ভাববাদী (idealist) হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি যেহেতু ভীষণভাবে উপনিষদীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাই 'রবীন্দ্রদর্শন উপনিষদের আলোকে'[১] সৃষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সৃষ্টির মূলে আছে এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তি। এই শক্তি সকল সৃষ্টির মধ্যে সতত বিকাশমান। পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে এই সত্তা প্রকাশিত। মানবসমাজে, মানব আত্মায় সর্বত্র এই শক্তির বিকাশ বিরাজমান। একে তিনি বলেছেন বিশ্বচেতনা। এই বিশ্বচেতনা সুসামঞ্জস্যরূপে সর্বত্র বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মানুষ এই বিশ্বচেতনাকে উপলব্ধি করার জন্য সতত চেষ্টায় রত এবং পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মাধ্যমে তা লাভ করা সম্ভব। শিক্ষা এইরূপ আত্মবিকাশের প্রধান মাধ্যম হতে পারে।

[১] মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন, রবিসন্ধ্যা, দ্বিতীয় সংখ্যা (চতুর্থ বর্ষ) বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, জুন ২০০৫, পৃ.১৮।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সবথেকে বৃহৎ পার্থক্য হল মানুষ চেষ্টার দ্বারা তার লক্ষ্যে পৌঁছেছে আদিমযুগ থেকে। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকে পরিবর্তিত করে মানুষ বিকাশ লাভ করেছে। সৃষ্টির শুরুর থেকেই মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষণীয়। তার ফলে মানুষ পরমানন্দ লাভ করে। তাঁর জীবন দর্শনের মূল বক্তব্য হল - বিশ্ব বৈচিত্রের মাঝে তার ঐক্যের নিয়মকে জেনে, তাকে আনন্দরূপে লাভকরাই হল মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। রবীন্দ্র জীবনদর্শনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ভীষণভাবে তাঁর জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন বিশেষত ভাববাদী (Idealist) চিন্তাধারার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ একথা পূর্বেই উল্লিখিত। তবে একদিকে তার শিক্ষাদর্শন ভাববাদী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও, প্রয়োগের সময় লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি ভীষণরূপে প্রকৃতিবাদী বা স্বভাববাদী (Naturalist) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। তিনি যেমন, বিশ্বমানবাত্মার পরিপ্রেক্ষিতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেছেন, শিক্ষার সংজ্ঞাও দিয়েছেন সেই নীতির উপর ভিত্তি করে।

শিক্ষা কি? এবং তার মূল লক্ষ্য :

রবীন্দ্রনাথের মতে, সেটাই প্রকৃত শিক্ষা, যা কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশনই করে না। যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে, ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন কি? - তা একটা বাক্যে বলতে হলে বলা যায়, এটি শিক্ষার্থীর স্বাধীন, সতন্ত্র, ব্যক্তিত্বের ও মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ এর কথা বলে। আর তাঁর নিজের ভাষায়

অন্তরআত্মার বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক গতানুগতিক শিক্ষাকে ভীষণভাবে সমলোচনা করেছেন।

তিনি 'শিক্ষা' প্রবন্ধে বলেছেন - ''তুমি কেরাণির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনক্রমে পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে' এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পাড়ার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায়না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।''[২] কারণ আমাদের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষের আদর্শকে স্থান দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষ চিরদিনই কিছু নৈতিক আদর্শের উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে, চিরদিনই বিশ্বসত্তার বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এসেছে। তাই তার শিক্ষার লক্ষ্য যদি তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতীক না হয়, তাহলে তা সমাজের কল্যাণ সাধন করতে ব্যর্থ হয়। তাই দেশবাসীদের একথা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষের এই সাধনাতে ব্রতী হওয়াই ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তবে সে শিক্ষা কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষাও নয়। বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। তবে সে শিক্ষা হবে যথার্থ শিক্ষা, পরিপূর্ণ শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন মূলত, এমনই এক যথার্থমুক্ত শিক্ষার কথা

[২] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃ.১৩২।

বলে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রবন্ধে বলেন - ''যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে। ... সেই শক্তিকে ও উদ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটেই তাঁহাদের সবচেয়ে প্রধান কাজ।''[৩] এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতে, কোনো বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রণালীকে জাতীয় নামে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ স্বজাতীয় বা বিজাতীয় শাসনের দ্বারা যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট শিক্ষার আদর্শ বেঁধে ফেলতে চায় মানুষকে, তখন সেটাকে কখনই আদর্শ শিক্ষা বলা যায় না। তখন এই আদর্শটি সাম্প্রদায়িক এবং দেশবাসীর জন্য সেই নির্দিষ্ট সীমিতশিক্ষার আদর্শ ভীষণরূপে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে একথা রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যে শিক্ষা স্বজাতির নানান মানুষের নানান চেষ্টার দ্বারা চালিত হয়। আর তাকেই জাতীয় বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন অনুশীলন করে আমরা দেখি যে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তিনি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উপর বিকাশের অস্ত্র হিসাবে ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন মূলত সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সমকালীন সমাজের বিরুদ্ধে, এককথায় তৎকালীন স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাঁর মতে মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক নির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার যন্ত্রণায়

---

[৩] তদেব, পৃ.১২৮।

জর্জরিত। এই যন্ত্রণাকে তিনি অমোঘ বলে মেনে নেননি। বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষাকে আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক করে তুলতে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি আশ্রমিক শিক্ষা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে তিনি দেখেছিলেন 'তোতা কাহিনী'।[৪] যার মধ্যে খাঁচা আর রাশি রাশি পুঁথি ছিল। তাঁর মতে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার অঙ্গ। চলবে তার সঙ্গে এক তালে, লয়ে, সুরে এবং তা কখনই দৈনন্দিন যাপিত অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জীবন চলার পথে শিক্ষা যে অপরিহার্য্য একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সচেতন হোক বা অচেতন হোক প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি মানুষকেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু হঠাৎ যদি প্রশ্ন ওঠে শিক্ষা কি? তাহলে অনেকের পক্ষেই ব্যাপারটি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিকতার যেমন বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি সে শিক্ষাকেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্ব এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলে।

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণত, মানুষ কেবল তথ্য আহরণকেই শিক্ষা বলে মনে করত। শিক্ষকের কাছ থেকে বা বই পড়ে যেভাবেই হোক না কেন কিছু না জানা বিষয়কে জেনে নেওয়াই ছিল শিক্ষা। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর মন যেন শূন্য জলপাত্র আর শিক্ষক বা বই থেকে সেই পাত্র পূর্ণ করাই হল শিক্ষা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষা কেবল পুঁথি পড়া নয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন ''জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের

[৪] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, লিপিকা, বিশ্বভারতী, ১৪২৭, পৃ.৮৯।

স্বভাবত মনেই আসেনা। সে সম্বন্ধে যেটুকু চিন্তা করিতে যাই তাহা পুঁথিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই সেটুকু অন্যের অনুকরণ।"[৫] তাই জীবনের ক্ষেত্রকে বড় করতে হলে শিক্ষার লক্ষ্যটি স্থির হওয়া দরকার। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির হলে জীবনের বৃহৎরূপ দেখা যায়। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন - ''এই পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্যবেধের আহ্বান সকলেই শুনিতে পাইয়াছে; মোটের উপর সকলেই জানে সে কি চায় ... এই লক্ষ্যবেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্য কী পাইতে হইবে সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং কোথায় যাইতে হইবে তাহাও আমাদের সন্মুখে স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট নাই।"[৬]

তাই মানবজীবনের পরম লক্ষ্যটি প্রথমত, স্পষ্ট হওয়া দরকার। জীবনের ক্ষুদ্র আকাঙ্খাগুলি ত্যাগ করে বৃহৎ জীবনের লক্ষ্য স্থির হওয়া চাই। আমাদের দেশে সচেতনভাবে এই লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির হলে আমাদের দেশের শিক্ষাকে সত্য আকার দেওয়া সম্ভব। কিন্তু জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই অথচ শিক্ষা আছে এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি এবং অভ্যন্তরীণ শিক্ষা :

শিক্ষা জীবন এবং যাপিত অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং এক, এ কথা পূর্বে উল্লেখিত। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার নিয়মের থেকে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শন ভীষণভাবে বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের জন্য যে শিক্ষা কামনা করেছেন তা ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, বোধের

[৫] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃ.১৩১।

[৬] তদেব, পৃ.১৩১।

শিক্ষা। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্য শিক্ষা। রবীন্দ্রজীবনদর্শনের ন্যায় রাবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনেও মানুষ ভীষণ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে বিদ্বজনেরা অনেকে সময়ই এইপ্রকার ব্যবস্থাকে pipeline process বলে থাকেন। বলা বাহুল্য, দুর্ভাগার বিষয় আমাদের দেশের বহু মানুষ শিক্ষা বলতে এখনও পর্যন্ত এই বিশেষ পদ্ধতিকেই বোঝেন এবং আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে বর্তমান অনুসৃত পদ্ধতি এর থেকে খুব বেশি উন্নত নয়। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার এই ধরনের অসম্পূর্ণতার কথা অনুভব করেছেন এবং তার উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। জ্ঞান সম্পর্কে সংকীর্ণ মতবাদের জন্যই শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এই সংকীর্ণ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

এক্ষেত্রে জ্ঞানকে আমরা দুভাগে ভাগ করে বিষয়টি বুঝতে পারি। একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জ্ঞান এবং অন্যটি চিন্তালব্ধ ও বিমূর্ত। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে সংকীর্ণ অর্থে পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া তত্ত্বগত জ্ঞানকেই স্মৃতি দিয়ে আয়ত্ত করাই হল শিক্ষার কাজ। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এই ধারণা, সংকীর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং আংশিক সত্য। কারণ প্রত্যেক তত্ত্বগত বিষয়ের একটি বাস্তব ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। দৈনন্দিন যাপিত অভিজ্ঞতার জ্ঞানকে আমরা আমাদের চিন্তা, যুক্তি ও অন্ত:সমীক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করি। তাই সত্যজ্ঞান কখনই একজন মানুষের মধ্যে বাইরে থেকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় না। আত্মচেষ্টার মাধ্যমে তা অর্জন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অভ্যন্তরীণ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষাগ্রহণের তাগিদটি ভেতর থেকেই উপলব্ধ হয়। তাঁর মতে, কোনো স্থির, গতানুগতিক অপরিবর্তনীয় তথ্যের আহরণ কখনই গতিশীল জীবনের জন্য উপযোগী হয় না। মানুষ যে

জন্মগত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়, তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি সেই সম্ভাবনার বিকাশের অনুকূল নাও হতে পারে। তাই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে, সার্থক অভিযোজনের জন্য মানুষকে প্রতি পদক্ষেপে তার প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বভাব ও প্রাথমিক আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে চলতে হয়। এই পরিবর্তন শিক্ষা। শিক্ষা হল তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন ও পরিমার্জন প্রক্রিয়া। রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমস্ত জীবনই এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে জীবন থেকে পৃথক করে দেখেননি। তিনি বলেছেন শিক্ষা হবে জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

রবীন্দ্রনাথ এমন এক সাবলীল স্বত:স্ফূর্ত শিক্ষার কথা বলেছেন যাতে তা কোনভাবে একজন শিক্ষার্থীর কাছে বোঝা হিসাবে উপলব্ধ হবে না এবং শিক্ষার সঙ্গে এমন এক প্রাণের সম্পর্ক স্থাপন হবে, যে তাকে নিজের থেকে আলাদা বলে মনে না হয়। জীবন ও শিক্ষা এক। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা একপ্রকার দমবন্ধকর ছিল ছাত্র ছাত্রদের নিকট। এইপ্রকার শিক্ষায় জীবনচর্যার বা চর্চার কোনো প্রতিফলন ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হতে চেয়েছেন, যা একজন শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিক সত্তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং এক। তাঁর আশা অধিকারীকে লেখা পত্রটিতে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয় –

১৫ আশ্বিন ১৩৩৭

ওঁ

বার্লিন

কল্যাণীয়াসু,

আশা, ... রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদ্‌লে দিয়েছে ..... কিন্তু আমাদের দেশের কৃষি একদিকে মূঢ় আর এক দিকে অক্ষম, শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত ..... আমি বরাবর বলে এসেচি শিক্ষাকে জীবযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। এখানে এসে দেখলুম এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেচে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি। এরা পাস করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না - সর্ব্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁথির পংক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকেনা। কতবার চেষ্টা করেচি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনো দিন জান্‌তে চাইতে শেখে নি, – প্রথম থেকেই কেবলি বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে' ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে। আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজির ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুল বনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করো কি? সে বল্‌লে, জানি নে। - এ সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বল্‌লুম, জিজ্ঞাসা পরে কোরো কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কিনা আমাকে বলো। সে বল্‌লে আমি জানি নে। অর্থাৎ এ ছাত্র কেনো বিষয়ে স্বয়ং কিছু ইচ্ছা করবার চর্চ্চাই করে না – তাকে চালনা করা হয় সে চলে, আপন থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না। এ রকম সামান্য বিষয়ে মনের এতটা অসাড়তা যদিও সাধারণত আমাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না কিন্তু এর চেয়ে আরো একটুখানি শক্তরকমের চিন্তনীয় বিষয় যদি পাড়া যায় তবে দেখা যাবে সে জন্যে এদের মন একটুখানিও প্রস্তুত নেই। এরা কেবলি অপেক্ষা করে থাকে আমরা উপরে থেকে কি বলতে পারি তাই শোনবার জন্যে। সংসারে এ রকম মনের মতো নিরুপায় মন আর হতে পারে না। ..... শিক্ষা কেবল পুঁথি পড়ার শিক্ষা নয়। আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি

অনেকবার বলেচি, লোকহিত এবং স্বায়তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবী করে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোট সীমার মধ্যে তারি একটি সম্পূর্ণরূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার - সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হতে পারবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চ্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে না, তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করতে হয় - সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম ..... এখানে এসে অবধি স্বদেশের শিক্ষার কথা অনেক ভাবতে হয়েচে। আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি দিয়ে কিছু এর আহরণ এবং প্রয়োগে করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আর সময় কই - আমার পক্ষে পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পও হয়তো পূরণ না হতে পারে। প্রায় তিরিশ বছর কাল যেমন একা একা প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে লগি ঠেলে কাটিয়েছি - আরো দু চার বছর তেমনি করেই ঠেলতে হবে - বিশেষ এগোবে না তাও জানি - তবু নালিশ করব না। .....।
ইতি ২ অক্টোবর ১৯৩০

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৭]

[৭] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (অষ্টাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২০, পৃ.৩৮৭।

মাতৃভাষায় শিক্ষা :

আমাদের শিক্ষা যে আমাদের সত্তার থেকে ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার একটি কারনরূপে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাকে ভীষণ ভাবে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন ''বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছেনা, আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশী। যে-ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয়, সে-ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে। ততদিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি-পেটা এবং কুলুপ-খোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়। আমাদের মন তেরো চোদ্দো বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে, সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্তবিদ্যার শিলাবৃষ্টিবর্ষণ হইতে থাকে, তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কী করিয়া?''[৮] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বাংলা ভাষাকে অনবরত বর্জন করে কেবল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাওয়া আদতে অতি দুর্বল ভাবনা, কারণ সে শিক্ষায় বিস্তারের পথ সংকীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষার বিস্তার হোক। কারণ শিক্ষা বিস্তার লাভ না করলে তার গৌরব কোথায়?-এ কথা সত্য। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে সর্বজনীন শিক্ষার পথে ইংরেজি যে সর্বপ্রধান বাধা এবং মাতৃভাষাকে আমাদের শিক্ষার বাহন না করলে যে বিদ্যার প্রসার লাভ করবে না, একথা জোরের সঙ্গেই তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে বলেছেন ''মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালীকে দন্ড দিতেই হইবে?

[৮] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৬, পৃ.৫৭৪।

এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক ... সমস্ত বাঙালীর প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই"?[৯] বলাবাহুল্য এ আক্ষেপের প্রশ্ন সমগ্র বাঙালি মননের। দেশজ ভাষার প্রতি দেশজ মানুষের অস্পৃশ্যতা রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন বিরোধী। 'শিক্ষার বিকিরণ'-প্রবন্ধেও একই মত লক্ষ্য করা যায়। শহরকেন্দ্রীক ঔপনিবেশিক শিক্ষার সমালোচনা করে তিনি বলেন ''এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তাঁর পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষাঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল কামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণ বেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সার্বজনীনতার পথে বাধা হিসাবে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাকে প্রধানত দায়ী বলে মনে করেছেন। কিন্তু কখনই তিনি পুরোপুরি পাঠ্যক্রম থেকে ইংরেজি বাতিল করার কথা বলেনি। তিনি বলেছেন, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই শুধু জীবিকা অর্জনের জন্যে নয়। কেবল ইংরেজি কেন, ফরাসি, জার্মান শিখলে আর ভাল। কিন্তু শুধুই ইংরাজি ভাষায় নির্ভর করে সার্বজনীন শিক্ষা আসেনা। যে ছাত্র বাংলা জানে, ইংরাজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কী তাদের স্থান দিতে অনিচ্ছুক? এই প্রশ্নও তিনি শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার সার্বজনীনতা তাঁর শিক্ষাদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিছু

---

[৯] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৮, পৃ.৬২৩।

[১০] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষোড়শ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৭, পৃ.৩২৮।

শ্রেণীর বাঙালী সেই সময় সমাজে শিক্ষিত হয়ে ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘‘শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগ শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হল এনলাইটেনড,আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগলো পূর্ণ গ্রহণ। ... একদিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্যদিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। ... সেই জন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্ট্যতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।’’[১১] ঔপনিবেশিক ইংরাজি শিক্ষার বিরুদ্ধে এমন আলোচনা তখনকার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনে স্পষ্ট। আলোচিত সমস্যাটি প্রাসঙ্গিক এবং বর্তমানেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা একথা প্রকাশে আমাদের দ্বিধা নেই।

অন্যদিকে ভাষার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হল আমাদের ভাষার সঙ্গে ভাবের সামঞ্জস্যের অভাব। বাল্যকাল থেকেই শিশুর ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবশিক্ষার মিলন হওয়া দরকার। কারণ বাল্যকাল থেকেই যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং সেই ভাবের সঙ্গে জীবন-যাপন নিয়মিত হয় তখন জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। মানুষ সহজ হতে পারে এবং তার মনের ভাব সহজে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু তৎকালীন বাঙালী সমাজে কিছু ব্যক্তি বাল্যকাল থেকে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত হতে চেয়ে না পারে ইংরাজি ভাষাটিকে পুরোপুরি রপ্ত করতে, না পারে বাংলাভাষাকে। সেক্ষেত্রে তাদের ভাষার সঙ্গে ভাবের সামঞ্জস্য হয় না। ফলত তারা তাদের মনের ভাব দুটি ভাষাতেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে ব্যর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে

---

[১১] তদেব, পৃ.৩২৯।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - ''পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না। আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে; যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। ... ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকটসংসর্গ আমরা লাভ করি না ... অন্যদিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ় সম্বন্ধ রূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে।''[১২]

ভাষা ও ভাবের যথার্থ সামঞ্জস্যের অভাবে মাতৃভাষার প্রতি একপ্রকার অনীহা লক্ষ্য করা যায় তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে। তৎকালীন শিক্ষিতব্যক্তিদের মতে ''... বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায় এ ভাষা আমাদের মতো শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে।''[১৩] মাতৃভাষা প্রকৃতরূপে না জানায় তাদের মাতৃভাষার প্রতি এরূপ সংশয় দেখা দেয়। তারা মাতৃভাষার মাধ্যমে যথাযথ ভাবপ্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। ভাষার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সামঞ্জস্য ব্যাহত হয় এবং সর্বোপরি জীবন থেকে শিক্ষা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। তৎকালীন পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ কামনা করেছিলেন - ''এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, ... ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।

[১২] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃ.১৮।

[১৩] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৬, পৃ.৫৭২।

আমরা আছি যেন -

পানীমে মীন পিয়াসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানিও আছে পিয়াসও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে, এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।"[১৪]

অর্থাৎ ভাব ও ভাষা থাকা সত্ত্বেও তারা তা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ ইংরাজি একটি বিজাতীয় ভাষা। আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গে এর শব্দবিন্যাস ও পদবিন্যাসের কোনপ্রকার মিল ছিলনা। সেক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে শিশুর ধারণা স্পষ্ট হওয়ার পূর্বেই তাকে মুখস্থ করতে হত। রবীন্দ্রনাথের মতে, তৎকালীন মাষ্টার মশাইরাও ভালোভাবে বাংলা কিম্বা ইংরাজি কোনোটাই জানতেন না। ফলে তারা শিশুদের শেখানোর থেকে ভুলটা বেশী করে শেখাতেন। "Horse is a noble animal"[১৫] - এটিকে কিভাবে প্রকাশ করা যায়? যদি বলা হয় ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু অথবা ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, কিম্বা ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো - সেক্ষেত্রে এই সবকটি বর্ণনাই ছাত্রদের মন:পুত হত না। সেক্ষেত্রে গোঁজামিল দিয়ে অল্প শিখে কোনোপ্রকারে ভুলটাই শেখা হতো। রবীন্দ্রনাথের মতে ছাত্ররা মনে করতো ''... 'টানিয়া-বুনিয়া কোনো মতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাশ হই;

[১৪] তদেব, পৃ.৫৭২।
[১৫] তদেব, পৃ.৫৬৭।

আপিসে চাকরি জোটে'।"[১৬] তিনি বিষয়টিকে শঙ্করাচার্যের বাণীর সঙ্গে তুলনা করে আরও বলেন - ''সচরাচর যে অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের এই বচনটি খাটে;

অর্থমনর্থং ভাবয় নিতং

নাস্তি তত: সুখলেশ: সত্যম।"[১৭]

অর্থাৎ অর্থকে অনর্থ বলে জানলে তাতে সুখ ও সত্য কোনোটাই থাকে না। তাই তাঁর মতে, শিশুরা কেবলমাত্র বাংলা শিখলে তারা হয়ত রামায়ণ ও মহাভারত পড়তে পারতো। কিছু না শিখলে তারা অন্তত খেলা করতে পারতো ও প্রকৃতিকে অনুভব করতে পারতো। কিন্তু ইংরাজি ভাষায় শিক্ষালাভ করতে গিয়ে শিশুরা তা শিখতে পারেনি, খেলতেও পারেনি, মনের ভাব প্রকাশেও ব্যর্থ রয়েছে।

তাই প্রাথমিকভাবে শিশুর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা হওয়া দরকার বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাতে ভাব ও ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য সহজে হয়। শিশুর মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তৎকালীন সমাজের ন্যায় বর্তমান সমাজেও এইপ্রকার সমস্যা দেখা যায়। বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। ''বর্তমান শিক্ষা একটাই প্রয়োজনিক, অত্যধিক সুযোগ সন্ধানী যা মানুষকে বাঁচার আনন্দটুকুও দিতে পারে না"[১৮] বর্তমানে প্রায়

---

[১৬] তদেব, পৃ.৫৬৭।

[১৭] তদেব, পৃ.৫৬৭।

[১৮] চট্টোপাধ্যায়, সমীর, নন্দ, বিষ্ণুপদ (সম্পাদক), বিবিধ প্রসঙ্গ বিষয় রবীন্দ্রনাথ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫,পৃ.৪৭।

অধিকাংশ উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালীরা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎজীবন সুনিশ্চিত করতে ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। ফলত প্রাথমিক স্তর থেকেই তারা ইংরাজি ভাষাটিকে প্রধাণত রপ্ত করতে চায় এবং মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অনীহা দেখা যায়। অন্যদিকে, ইংরাজিভাষা কে সম্পূর্ণরূপে রপ্ত করতে না পারায় অধিকাংশ বাংলা মাধ্যমে পঠন-পাঠনরত ছাত্র-ছাত্রীরা হীনমন্যতার স্বীকার হয়। তাই প্রাথমিকস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুশিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। এতে উক্ত সমস্যাটির সমাধান হয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। যদিও ইংরাজি ভাষার গুরুত্বকে তিনি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেননি কখনও।

আশ্রমিক শিক্ষা :

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করার জন্য ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন প্রকৃতির কোলে এবং পরবর্তী কালে ১৯২১ সালে এই আশ্রমকে বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ মানুষ এবং প্রকৃতির আধ্যাত্মিক মিলনের মধ্যেই মানুষের বিকাশের সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি মনে করতেন শিশু শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশটি। বাড়িঘর, আকাশ, বাতাস, পথঘাট,গাছপালা, জীবজন্তু, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি নিয়ে গঠিত বাহ্য প্রকৃতি সবসময়ই শিশুর শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। শিশুর বাহ্যিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু যে দেশে বসবাস করে তার জল, হাওয়া,

প্রাকৃতিক সংগঠন, নৈসর্গিক ঘটনাবলি, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ সবই তার শিক্ষাকে বিশেষ রূপে প্রভাবিত করে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি ধারণা, মনোভাব প্রভৃতি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি বলেছেন - ''আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারিনি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে।''[১৯] তাই তিনি আরও বলেছেন - ''আমার আকাঙ্খা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে - এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব।''[২০] তাই শিশু শিক্ষার জন্য আলো, বাতাস, গাছপালা, মুক্ত আকাশকে তিনি চক, বোর্ড, পুঁথি ইত্যাদির মতো আবশ্যিক বলে মনে করতেন।

[১৯] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, ১৪১৯, পৃ.২৫।

[২০] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দশ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৬, পৃ.২৪৯।

Open air class in the campus (Santiniketan)

Shaha, Shambhu, Faces & Places of Visva-Bharati A collection of Phtographs, [R.B. Acc. no: SS248] Plate 28, Visva-Bharati, Kolkata, 2008

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আশ্রমিক শিক্ষার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষার সব বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে তিনি সংযোজিত করতে চেয়েছিলেন। জীবনযাপনের রীতিতে তিনি সরল ভারতীয় জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন - ''পূর্বেই আভাস দিয়েছি, আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর উর্দ্ধ শিখরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। দেখা যায় অতি ভালো কলেজি ছেলেরা পদবি অধিকার করে, বিশ্ব অধিকার করেনা। প্রথম থেকেই আমার সংকল্প ছিল আশ্রমের ছেলেরা চারদিকের অব্যবহিত-সম্পর্ক - লাভে উৎসুক হয়ে থাকবে; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন - সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে, যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।''[২১]

প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুমনের সহজ ও স্বত:স্ফূর্ত বিকাশ রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল উন্মুক্ত প্রান্তরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে মনের চর্চা করার কথা তিনি তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে উল্লেখ করেন এবং তা প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করেছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বন্ধ করে শিক্ষা প্রদানের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র সুপ্রিয় ঠাকুর যথার্থই বলেছেন - ''সবকিছুর মধ্যে এমন একটা আনন্দ ছিল, যে তার জন্য যে কোনও মূল্য দেওয়া যায়। ওই খোলা

---

[২১] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষোড়শ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৭, পৃ.৩৫০।

আকাশের তলায় প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠার যে কি মূল্য তা কি হিসাব করে পাওয়া যায়? তার সঙ্গে যদি মানুষের ভালোবাসা যুক্ত হয়, সে তো স্বর্গের কাছাকাছি হয়ে দাঁড়ায়।"[২২]

রবীন্দ্রনাথ বোধের শিক্ষাকে তার বিদ্যালয়ে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, কলকারখানার দক্ষতার শিক্ষা কিম্বা স্কুলকলেজের পরীক্ষায় পাস ফেল নয়, তপোবনের শিক্ষায়, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিপূর্ণ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাই ব্যবসা বাণিজ্যের শহর কলকাতা ছেড়ে সুদূর বোলপুরে তিনি তার স্বপ্নের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল অকৃত্রিম প্রকৃতির সম্পর্কে থেকে শিশুর পল্লীমুখী বোধের শিক্ষার দ্বারা চিত্তের বিকাশ ঘটাতে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর এই ভাবনাকে নত স্বীকার করতে হয় তৎকালীন সামাজিক চাহিদার নিকট। কারণ তৎকালীন শহরের স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত সন্তানদের তার আশ্রমে ভর্তি করতে হয়। কিন্তু তাদের পিতা মাতাদের অনেকাংশেই রবীন্দ্রনাথের বোধের শিক্ষার অর্থ বোঝেন নি বা বুঝতে চাননি। তাদের কাছে মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে কথাটি অনেক বেশি অর্থবহ বলে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ভাবনার চেয়ে। তারা তাদের সন্তানদের ভবিষৎ জীবনের কথা ভেবে আশ্রমের নানাবিধ নিয়ম পরিবর্তন করতেও বাধ্য করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে কিছু পরিবর্তন করতে বাধ্য হন এবং মানুষ গড়ার লক্ষ্যে তাঁর remanticism হারিয়ে যায়। কারণ তৎকালীন বঙ্গদেশের মানুষ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথাটিই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং বর্তমান সমাজেও অনেকাংশেই বিষয়টি বোধ হয় ভিন্ন নয়। তৎকালীন সমাজে বিদ্যা

[২২] ঠাকুর, সুপ্রিয়, ছেলেবেলার শান্তিনিকতন, আনন্দ, ২০১২, পৃ.৯৩।

মানবতার বিকাশ করুক বা না করুক অর্থ উপার্জন করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং তা শিক্ষারও মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি ওঠে লেখাপড়া কেন শিখব? বিদ্যবান যদি ধনবান না হন তাহলে আদতে তার মূল্য ঠিক কতখানি? অর্থাৎ বিদ্যাবান হলে তার ধনবান হওয়াটাই কাম্য ছিল। বলাবাহুল্য এ বিষয়ে সংশয়টি কেবলমাত্র তৎকালীন দেশীয় পিতামাদের নয় বরং বর্তমানকালের বহু পিতামাতার মূল এবং মুখ্য প্রশ্ন এটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক স্কুল গড়তে চাননি। তিনি মানুষ গোড়ার আশ্রম তৈরী করতে চেয়েছিলেন। এই পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে সুপ্রিয় ঠাকুর বলেছেন - ''পৃথক হয়ে থাকার ভয়টাই হয়তো এই প্রতিষ্ঠানকে গড্ডলিকা প্রবাহে যোগ দিতে বাধ্য করল। অথচ আমরা তো একবারও ভেবে দেখলাম না যে রবীন্দ্রনাথ নিজের সর্বস্ব পণ করে বিদ্যালয়ের কারখানা ঘর থেকে ছাত্রছাত্রীদের টেনে বের করে আনারই চেষ্টা করেছিলেন।''[২৩] রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আশ্রমের শিক্ষায় শিশু মুখ্য হবে ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিশুর বিকাশ হবে। সেক্ষেত্রে শিশু ও প্রকৃতি অভিন্ন হয়ে থাকবে বড় আমি ছাপিয়ে যাবে ছোট আমির সমস্ত চাহিদাকে এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্কিত সত্তা সৃষ্টিশীল হয়ে উঠবে। শিশুরা একটি সার্থক ও পরিপূর্ণ জীবন পাবে। রবীন্দ্রনাথের উক্ত বাসনাটি রাণু অধিারীকে লেখা একটি চিঠিতে স্পষ্ট হয় --

[২৩] তদেব, পৃ.৪৭।

২৮ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

..... এরা যখন বড় হবে, যখন সংসারের কাজে প্রবেশ করবে তখন হয়ত মনে পড়বে - এই আশ্রমের প্রান্তর, এখানকার শালের বীথিকা, এখানকার আকাশের উদার আলো এবং উন্মুক্ত সমীরণ এবং প্রতিদিন সকালে বিকালে এখানে আকাশতলে নীরবে বসে ঠাকুরকে প্রণাম। আর সেই সঙ্গে আমাদের কথাও মনে পড়বে। যদি এই স্মৃতিতে ওদের মনকে উদার করে, চরিত্রকে সবল করে, ওরা যদি এই বিশ্বজগৎকে এবং নিজের জীবনকে বড় করে দেখ্‌তে পারে তাহলেই আমরা পুরস্কার হল - তাহলে ওদের সার্থক জীবনের মধ্যে আমার জীবনও সার্থক হল, ওদের পূজার মধ্যে আমার পূজা, ওদের প্রণামের মধ্যে আমার প্রণাম রয়ে গেল। ইতি ১২ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা[২৪]

[২৪] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (অষ্টাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২০, পৃ.৪২।

পাঠ্যক্রম :

শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পাঠ্যক্রম। পাঠ্যক্রম শিক্ষার একটি বিশিষ্ট উপাদান, যা শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলে। পাঠ্যক্রম বলতে কেবলমাত্র কতকগুলি পাঠ্য বিষয়কেই বোঝায় না, একজন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক এবং সুসংহত অভিজ্ঞতার সমষ্টিকেও বোঝায়। তাই শিশুশিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে পাঠ্যক্রমের সুনির্বাচনের উপরেও। শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার সমষ্টি, যার মাধ্যমে একজন শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং উপযুক্ত পাঠ্যক্রমের অনুশীলনের দ্বারা সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে শিশুর সঙ্গতি বিধান হয়। আর উপযুক্ত পাঠ্যক্রমের নির্বাচন নির্ভর করে শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, শিক্ষার্থীর প্রয়োজন এবং শিক্ষকের বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার উপর।

রবীন্দ্রশিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার অন্যতম যোগ্য বাহক হল পাঠ্যক্রম। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমটি একজন শিক্ষার্থীর জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে এবং এটি সমাজ সংস্কৃতির বিভিন্ন চাহিদাকে পরিপূর্ণ করবে। তিনি তাঁর শিক্ষাচিন্তায় পাঠ্যক্রমের সংজ্ঞাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেন। সেক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের সীমানা নির্দিষ্ট হতে বাধ্য, কিন্তু পাঠের সীমা যেন পাঠ্যক্রমেই আবদ্ধ না হয়। পাঠ্যক্রম কেবল জীবিকার ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকবে না। তাছাড়া শিক্ষা শুধু জ্ঞানচর্চা নয়, জ্ঞান, ভাব ও কর্ম -- তিনেরই সাধনা। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, নৃত্য ছাত্রদের শিক্ষাজীবনের অঙ্গ হবে। পাঠ্যক্রমকে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে হবে এবং জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। আর মাতৃভাষা ছাড়া এ

যোগ কখনই সম্ভব নয়। এছাড়া কর্মসাধনাকে, পারস্পরিক সহযোগিতকে পাঠ্যক্রমে বা তার পাশাপাশি সমান গুরুত্বে স্থান দিতে হবে। এই কর্মের সূত্রেই ছাত্ররা চারপাশের সমাজজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে সংস্কৃতির পূর্ণ রূপটি তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেছেন - ''আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীতবাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থ্য, দেয় বল; তেমনি যেসকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়।''[২৫] তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে হবে বিশ্বমানবের সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটানো এবং পাঠ্যক্রম হবে সেই সংস্কৃতির বাহক। রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে সেই সমস্ত বিষয়কেই গ্রহণ করেছেন যেগুলির মধ্যদিয়ে মানবসংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করা সম্ভব হবে। তিনি তাঁর পাঠ্যক্রমের ভিতর ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রকৃতিপাঠ, সংগীত, নৃত্য, শিল্পকলার পাশপাশি বিভিন্নরকম পল্লীউন্নয়নমূলক কাজ এবং সামাজিক কাজকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি প্রধানত মাতৃভাষায় শিক্ষার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতকে তিনি পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। তিনি অন্যান্য ভাষায় শিক্ষার কথাও

---

[২৫] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, ১৪১৯, পৃ.১৪৮।

বলেছেন। বিশেষত: সংস্কৃত ভাষার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সভ্যতার অগ্রগতির জন্য তিনি বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং জীবনের অগ্রগতির জন্য জীবনদর্শনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন। তাই বিজ্ঞান ও দর্শনকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে শিশুর বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রকৃতিপাঠের শিক্ষা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন। কারণ প্রকৃতিপাঠ শিশুকে প্রকৃতির বৈচিত্রের সঙ্গে পরিচিত করে, বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ ঘটায় ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে। প্রকৃতিপাঠে শিশু প্রকৃতির সাহচর্যেই প্রাকৃতিক নানা বৈচিত্র্যের পরিচয় পাবে ও তার মানসিক জগতে ঐক্যবোধ গড়ে উঠবে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র সুপ্রিয় ঠাকুর তাঁর আশ্রম শিক্ষার পঠন পাঠনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন - ''ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল তো সব স্কুলেই পড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি পাঠ বা ইন্দ্রিয়চর্চার ক্লাস বোধহয় সব স্কুলে থাকে না। প্রকৃতিপাঠের ক্লাসে আমরা শান্তিনিকেতন আশ্রমের সব গাছপালা দেখে বেড়াতাম। সব গাছের নাম জানতাম, কখন ফুল ফোটে, পাতা ঝরে, বা ফল ধরে, এসব আমরা লক্ষ্য করতে শিখতাম। তা ছাড়া পোকামাকড় সম্বন্ধেও এই ক্লাসে শেখানো হত। প্রজাপতির ডিম থেকে গুটিপোকা কি করে হয়, সেই পোকা সাজ বদল করে কিনা, কেমন করেই বা তা গুটি বাঁধে এবং অবশেষে কি করে গুটি ফুটে প্রজাপতি হয় এসব আমরা চিনতে শিখতাম।''[২৬] তিনি আরও বলেন - ''ইন্দ্রিয়চর্চার ক্লাসও খুব মজার ছিল। জিনিসের ওজন, একজায়গা থেকে আর একজায়গার দূরত্ব - এসব আন্দাজ করতে শিখতাম এই ক্লাসে ..... পাঠভবনে ছোটবেলায়

---

[২৬] ঠাকুর, সুপ্রিয়, ছেলেবেলার শান্তিনিকতন, আনন্দ, ২০১২, পৃ.৫০।

বিজ্ঞান ছিল এইরকমই জীবন্ত। বই মুখস্থ করা হাত থেকে আমরা অন্তত ওই বয়সটায় রেহাই পেয়েছিলাম।"[২৭] কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষা শুধুমাত্র পুঁথিগত তথ্য আহরণ করা নয়। তাই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়চর্চার অভিজ্ঞতার দ্বারা শিশুর সার্বিক বিকাশ করতে চেয়েছিলেন। অধ্যাপক অমরনাথ ঘোষ শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন - ''ইন্দ্রিয় শিক্ষার সূত্রেই ঘটে তার বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ। ইন্দ্রিয় বৃত্তির বাইরে যে একটি বুদ্ধিজগৎ আছে সে তার সন্ধান পায়। তখন প্রয়োজন হয় তাকে ঠিকপথে চালনার যাতে সে বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ানুশীলনের মধ্যে সমন্বয়ের সাহায্যে জ্ঞানের জগতে অবাধ বিচরণের সুযোগ পায়।"[২৮]

শিশুশিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তিত্বের সমস্ত শক্তি উন্মোচন করা এবং বন্ধনমুক্ত ব্যক্তিসত্তার সাহায্যে বিশ্বের সমস্ত কিছু সঙ্গে ঐক্যলাভ করা। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা বলতে কখনই স্বেচ্ছাচারকে বোঝান নি। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি ছিল প্রকৃতির সংযোগে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতার দ্বারা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করা।

"The first principle he adopted was that the pupils must have freedom and be happy. He would not tolerate the restrictions of even a classroom Whatever protection its roof might afford. There is nothing so free as the open air, nothing so healthy, nothing so inspiring as the sky. The cool shade of the tree would welcome him and his pupils.

---

[২৭] তদেব, পৃ.৫১।

[২৮] ঘোষ, অমরনাথ, রবিসন্ধ্যা বক্তৃতামালা, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৯৯৫, পৃ.২৯।

And the rays of the sun would weave changing patterns under the shade."[২৯]

তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলেছেন, তেমনি তাদের দেহ মনের বিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তাঁর আশ্রমে ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ভার নিত। বিশেষ প্রয়োজন না হলে শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল না। কারন তাঁর মতে, কঠোর শাসননীতি অযোগ্যতার প্রমাণ। তিনি স্বাধীনতাকে আত্মকর্তৃত্বের সমতুল্যরূপে বিচার করেছেন। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

"Freedom is necessary for growth of all kinds, mental or physical. Too much of routine throttles the growth of the pupil. In Gurudeva's School, except for the regular lessons, the children were free to choose their own hobbies and occupations. There were the games, and then, some read, some wrote, some tended the plants in their own gardens. They are reading was not confined to the text-books, not their writing to 'exercises'. There was the story – telling group. There were so many other alternatives to choose form."[৩০] অর্থাৎ তার শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যক্রমের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

---

[২৯] Tagore, Rabindranath, Roy, Kshitis (ed.), The Viswa Bharati Quarterly, Education Number VOL XII (Part I & II), 2004, p.13.

[৩০] Ibid, p. 13.

কারণ তাঁর মতে, স্বাধীনভাব থেকেই শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ হয় এবং তার মধ্য দিয়েই সে নিজেকে প্রকাশ করে। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে তিনি গান্ধীজির মতো সৃজনশীল কাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এইপ্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর সক্রিয়তার সুযোগ ছিল। তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন রীতি প্রবর্তন করেন। এই প্রথা বিশেষরূপে আধুনিক এবং মনস্তত্ত্বনির্ভরও। তাছাড়া তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে, বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজ, লাইব্রেরি গোছানোর কাজ, খেলা, নাটক, রচনা ও অভিনব ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই শিক্ষাপদ্ধতি গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাছাড়া ছাত্রদের বিভিন্ন রকম পল্লীউন্নয়নমূলক কর্মও শেখানো হত। যদুনাথ সরকারকে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি পত্রে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় --

২ জুন ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

..... একথা আপনার জানা আছে যে, যথোচিত পদ্ধতিতে আমি নিজে শিক্ষা লাভ করি নাই। মনে করিতে পারেন সেই অশিক্ষা-বশতই জ্ঞানান্বেষণের বিহিত প্রণালীকে আমি অশ্রদ্ধা করি .....।

অবশ্য একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিকতাকে আমি যেমন মানি ভাবুকতাকেও তেমনি মানি। আমাদের আশ্রমের বায়ুতে সেই ভাবুকতার উপাদান যদি কিছু থাকে তবে সেটা কি চিত্তবিকাশের পক্ষে হানিকর? সেই সঙ্গে আর কিছুও কি নাই? এখানে যে কৃষিবিভাগ খোলা হইয়াছে তাহা যদি কাছে আসিয়া দেখিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে তাহা যেমন বৈজ্ঞানিক তেমনি কার্য্যোপযোগী, তাহার কার্য্যক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রণালী বহুব্যাপক ..... এখানে ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, চামড়া পাকা করিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে .... ইতি ১৯ জৈষ্ঠ ১৩২৯

বিনীত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[Recd. Darjiling, 6 June 1922][৩১]

[৩১] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (পঞ্চদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪০২, পৃ.২১।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের আদর্শ জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন প্রভাতে উপাসনা করাতেন। তারপর নানা কর্মের মধ্য দিয়ে তাদের নৈতিক শিক্ষা ও সমাজীবনের শিক্ষা দেওয়া হত যা আদর্শ জীবন গঠনের সহায়ক।

শিক্ষকের ভূমিকা :

শিশুর আত্মবিকাশের পথে শিক্ষকের ভূমিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একজন আদর্শ শিক্ষকই আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী গড়ে তুলতে সক্ষম। রবীন্দ্রশিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষকের ভূমিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ-সরল সম্পর্ক গড়ে না উঠলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। তাঁর মতে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই শিক্ষা সম্ভবপর হয়। তাই শিক্ষককে সহায়কের ভূমিকাটি পালন করতে হয়। বিশেষ সহানুভূতির দ্বারাই শিক্ষার্থীর মনের কাছাকাছি আসা যায় এবং তার চিন্তন ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করা যায়।

তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে অনুকূল এবং প্রীতিময় সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেটি দেখা প্রয়োজন। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষক যদি কঠোর ব্যক্তিত্ব নিয়ে শিক্ষার্থীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন তাহলে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে না। তাছাড়া শিক্ষক কখনই শিশুর উপর তার নিজস্ব মতামতটি প্রতিস্থাপন করবেন না। কারণ এটি শিক্ষার্থীর চিন্তন ক্ষমতার পথে বাধার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র তথ্যকেন্দ্রিক শিক্ষাভারে ভারাক্রান্ত না করে, প্রাকৃতিক পরিবেশে তার চিন্তনক্ষমতা,

মনোযোগ, আগ্রহের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে তার আত্মবিকাশে সহায়তা করা। তাই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়া যাতে কল্যাণকর পথে এগোয় তার জন্য সুপরিচালনা অপরিহার্য।

নারীশিক্ষা :

রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্বে নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব লক্ষণীয়। সমাজ তথা দেশের উন্নতি সাধনের জন্য নারীদের শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। তিনি নারী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁর মতে, পুরুষ শিক্ষার আলোকে আলোকিত হতে পারলে নারীদেরও তার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কারণ শিক্ষা হল মনুষ্যত্ব লাভের পথ, আর সেই শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষাকে সমর্থন করেছিলেন কারণ তাঁর মতে, পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও তার মনুষ্যত্ব এবং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। তিনি বলেছেন - ''বিদ্যা যদি মুনষ্যত্ব লাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারিনা।''[৩২] অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়কেই শিক্ষিত হতে হবে। এপ্রসঙ্গে আশা অধিকারীকে লিখিত একটি পত্রে তাঁর অভিপ্রায়টি আরও সুস্পষ্ট হয় -

---

[৩২] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষোড়শ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৭, পৃ.২৮৫।

১৯ ভাদ্র ১৩৩৭

ওঁ

বার্লিন

কল্যাণীয়াসু,

ভক্তি ..... এবারে মনে সঙ্কল্প করে এসেচি মেয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে কিছু সম্বল করে নিয়ে যাব। ভরতবর্ষে যে শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাব্যবস্থা আছে তার পঙ্গুতা আমরা সবাই জানি। কিন্তু উপায় নেই। পেটের দায়ে ছেলেরা এই ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য - কিন্তু জীবিকার জন্যে শিক্ষা মেয়েদের তেমন অপরিহার্য্য হয় নি এইজন্যে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে বিদ্যাদানের উৎকৃষ্ট প্রণালী মেয়েদের জন্যেই প্রবর্তন করা সম্ভবপর। যদি করে তুলতে পারি তবে এবারকার মতো এইটেই আমার শেষ সার্থকতা হবে।

..... ইতি ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৩]

---

[৩৩] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (অষ্টাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২০, পৃ.৪০৩।

তাঁর মতে তৎকালীন পুরুষকেন্দ্রিক সমাজ নারীর জন্য যে প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল তা যথাযথ ছিলনা। তাই তিনি বলেছেন ‘‘নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।’’[৩৪] তাই নারীকেই নিজের চেষ্টার দ্বারাই মুক্ত হতে হবে এবং গতানুগতিক শিক্ষার আদর্শ থেকে জীবনের বৃহৎ আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। নারীকে সেক্ষেত্রে গতানুগতিক হলে চলবে না তাকে উপলব্ধি করতে হবে সংসারের সুখ সৃষ্টি করাই তার একমাত্র আদর্শ নয়। তিনি বলেছেন ‘‘এ কথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী, সামান্য ললনা নহেন; তিনি তাহার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দু:খে সহচরী হইয়া সংসারপথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।’’[৩৫] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন শুধুমাত্র সংসার জীবনযাপনে নারীজীবনের স্বার্থকতা নেই। তার অতিরিক্ত আদর্শের প্রয়োজন যা শিক্ষার মাধ্যমে উপলব্ধ হয়। যার দ্বারা সে তার চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। এমনকি, সংসার জীবন ঠিকমত পরিচালনা করতেও নারীশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন বলেই তিনি মনে করতেন। সেক্ষেত্রে ‘‘মেয়েরা যদি বা কান্ট-হেগেল ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিত্যন্ত দূর-ছাই করিবে না।’’[৩৬] তাই নারীরা শিক্ষিত হয়েও সমাজ সংসারের প্রতি কর্তব্য থেকে বিরত থাকবেনা বলেই তিনি মনে করতেন।

---

[৩৪] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষোড়শ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৭, পৃ.২৮৫।

[৩৫] তদেব, পৃ.২৮৫।

[৩৬] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃ.১৩৯।

কিন্তু তৎকালীন সমাজ মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে একপ্রকার ভয় থেকে জীবলোকে নারীদের পুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ''মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।''[৩৭] কারণ তৎকালীন সমাজ একথা বিশ্বাস করতো যে, মেয়েদের স্বভাবে কেবলমাত্র ভালোবাসা ও প্রেম রয়েছে। এর অতিরিক্ত কিছু সেখানে থাকতে পারেনা। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম হল শুধুমাত্র ভালোবাসার নিয়ম। তাই সমাজ মেয়েদের থেকে দাবি করে থাকে তাদের কর্মগুলি যেন সর্বদাই সংসারের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজ বিশ্বাস করতো যে নারীরা শুধুমাত্র পিতা, মাতা, স্বামী সন্তানকে সেবা করবে এবং এইটিই তাদের জীবনের মুখ্য আদর্শ হবে। ক্রমশ তৎকালীন মহিলারাও এই গতানুগতিক আদর্শকে গৌরবের সঙ্গে নিজ আদর্শরূপে গ্রহণ করতে থাকত। ফলত স্বার্থপর পুরুষেরা তাদের প্রতি অত্যাচার করত। আর নারীরা তাদের উক্ত উচ্চ আদর্শের দ্বারাই সমাজে পীড়িত এবং বঞ্চিত হতে থাকত। এমত অবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে নারীদেরই দায়ী করেন। যদিও তাঁর মতে তৎকালীন সমাজে পুরুষদের দাসত্বও নারীর থেকে বিশেষ উন্নত ছিলনা তৎকালীন রাজ্যতন্ত্র, বাণিজ্যতন্ত্র এবং সমাজের বিভিন্নশ্রেণীর মানুষের প্রভাবে।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের কোনোরূপ পার্থক্য না থাকলেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তিনি এপ্রসঙ্গে বলছেন ''বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের

---

[৩৭] তদেব, পৃ.১৩৮।

পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই।”[৩৮] তাঁর মতে নারীদের মানুষ হতে গেলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা দরকার। যার দ্বারা নারী উপলব্ধি করতে পারে যে তার দায় কেবলমাত্র ভালোবাসার দায় নয়, তার অতিরিক্ত এক লক্ষ্য রয়েছে তার জীবনে। যদিও মেয়েদের শরীর ও মনের প্রকৃতি পৃথক হওয়ার কারণে তাদের ব্যবহার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের কোনরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি রবীন্দ্রশিক্ষাতত্ত্বে। তাই তাঁর বিদ্যালয়ে তিনি নারী এবং পুরুষদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বোধের শিক্ষা :

রবীন্দ্র দর্শনের মূলনীতিটি হল জগতের সকল বস্তুর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা। প্রকৃতি,মানুষ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বিশ্বজগতের সঙ্গে সমন্বয় সাধনই হল এর মূল লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতশিক্ষা হল তাই যা একজন শিশুকে পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছুর সঙ্গে সঙ্গতি লাভ করে পরিপূর্ণভাবে বসবাস করতে শেখায়, সকল কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে শেখায়, সমন্বয় স্থাপন করতে শেখায়। তাই বোধের শিক্ষা প্রয়োজন। শৈশব কালে তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তৎকালীন তথ্যকেন্দ্রিক গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর চারপাশে অবস্থিত বস্তুগুলির সঙ্গে সমন্বয়

---

[৩৮] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষোড়শ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৭, পৃ.২৮৬।

বিধানের শিক্ষা দান করেনা। তাঁর মতে, আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হল জগতের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে তোলা। যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা কেবল জ্ঞান অর্জন করবে না, সমস্তকিছুর সঙ্গে যোগ স্থাপনও করবে।

ভারতবর্ষে চিরকালই একযোগ সাধনের আদর্শ রয়েছে। তাই শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবর্ষের এই আদর্শকে স্থান দিতে হবে। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল তথ্য প্রদান করে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানী করে তোলে, যার মধ্যে ভারতবর্ষের কোনো আদর্শকেই স্থান দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - ''ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মান্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন –

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্য: পরং মন:।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধে: পরতস্তু স:।।''[৩৯]

অর্থাৎ সাধারণত ইন্দ্রিয়গনকেই শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে।কিন্তু গীতায় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মনকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। আবার মনের চেয়ে বুদ্ধিকে বড় বলা হয়েছে এবং বুদ্ধির চেয়ে বড় হলেন তিনি, যিনি শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্বের সমস্ত কিছুর

[৩৯] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৭, পৃ.৭০১।

সঙ্গে মানুষের যোগ সাধন হয় তাই ইন্দ্রিয়কে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। কিন্তু এই যোগ আংশিক, ব্যাপক নয়। তাই মনকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কারন মনের দ্বারাই জ্ঞান যোগ হয় ,যা ব্যাপকতর। কিন্তু সেই জ্ঞানের যোগেও বিচ্ছেদ রয়ে যায়, তা সম্পূর্ণ হয় না। তাই বুদ্ধিকে মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়। কারন বোধের দ্বারাই চৈতন্যময় যোগটি পূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই যোগের দ্বারাই মানুষ তাঁকে উপলব্ধি করে যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেই পরম তিনি কে। গীতার এই 'যোগ'-এর ভাবনাটির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে রবীন্দ্রদর্শনের 'সমন্বয়'-এর ভাবনাটি। আর এর দ্বারাই তিনি বোধের শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষের আদর্শের মূল লক্ষ্যটি হল সকলের সঙ্গে সকলকে যুক্ত করা। তাই এটি ভারতবর্ষের শিক্ষারও মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই তিনি বলেছেন - ''কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কারখানায় দক্ষতাশিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে - প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে। আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা। বোধের তপস্যা নয়।''[৪০]

[৪০] তদেব, পৃ.৭০১।

তাই ভারতবর্ষের এই সাধনাতে ব্রতী হতে হলে ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলিকে কেবল ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানের শিক্ষার মধ্যে সীমিত থাকলে চলবে না, যা শিশুকে কেবল তথ্য দান করে, জাগতিক সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে। ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বোধের শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে, বোধের তপস্যায় ব্রতী হতে হবে।

তাঁর মতে উক্ত তপস্যায় মনকে পূর্বসংস্কার মুক্ত হতে হয়। তাই এই তপস্যায় ব্রতী হতে হলে সমস্তরকম পূর্ব সংস্কারগুলি থেকে মুক্ত হতে হবে যা আমাদের এই তপস্যায় বাধা দেয়। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার দুরাবস্থা লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন - ''অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন-কি, উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না।''[৪১] অর্থাৎ কেবলমাত্র পুঁথিগত তথ্য মুখস্থ করে প্রকৃত অর্থে বিদ্যালাভ করা যায় না বলে তিনি মনে করতেন। তাই তিনি একপ্রকার শিক্ষা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন তাঁর আশ্রমে যেখানে শিশুর সঙ্গে বিশ্বজগতের যোগ থাকবে। পরবর্তীকালে এটির বৃহৎ লক্ষ্যে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে বিশ্বের সকল ছাত্র মিলিত হয়ে যোগ সাধনের মধ্যে দিয়ে সামঞ্জস্য লাভ করবে। যেখানে শিক্ষা বোধের, শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার মধ্যে বোধ-বুদ্ধি যুক্ত না হলে সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। তাই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যথার্থ স্থান দিতে হয়, তা না হলে জীবনের সমস্ত দিক থেকে ব্যর্থ হতে হয়।

---

[৪১] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২৩, পৃ.২৫০।

গতানুগতিক তথ্যকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুকে কেবল জ্ঞানের তপস্যায় দীক্ষিত করে, যার লক্ষ্য কেবলমাত্র জীবিকা অর্জন। কিন্তু বোধের শিক্ষার দ্বারাই শিশু সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। তাই তাঁর মতে কেবল তথ্যকেন্দ্রিক কৃত্রিম শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে বিদ্যালয়ে, যার দ্বারা শিশুরা বিশ্বজগতের সঙ্গে যোগ সাধন করে ভারতবর্ষের মূল ঐতিহ্যকে বহন করবে।

যদিও আপত্তি হতে পারে, রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শন সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নয়। বর্তমানে রবীন্দ্রশিক্ষা দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কেউ বলতেই পারেন রবীন্দ্রশিক্ষাতত্ত্ব একটি অবাস্তব পরিকল্পনা মাত্র। আপত্তি হতে পারে রবীন্দ্রশিক্ষাতত্ত্বে দেশের আর্থ-সামাজিক দিকটি সম্পূর্ণরূপে উহ্য। এক্ষেত্রে বলা যায়, রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনের বাস্তবায়ন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং করেছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। তবে বর্তমানে তার বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় কিনা সেটি বিচার করা দরকার। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষা বিস্তার হোক। তিনি শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে হাতের কাজের মধ্যে দিয়েই নিম্নবিত্ত শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হত, যার মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করা হত। যদিও রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্বে আর্থ-সামাজিক দিকটি সম্পূর্ণরূপে উহ্য কিনা - বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ।

তবে, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রশিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন বোলপুরের ছাত্ররা কেবলমাত্র ভাবের শিক্ষাকেই গ্রহণ করে। এখানকার ছাত্ররা "exact knowledge বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং intellectual

discipline শেখে না।”[৪২] সেটি শেখানো বিশেষরূপে দরকার বলে তিনি মনে করতেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ এই আপত্তি প্রসঙ্গে উত্তরপত্রে বলেন, এর কারণ তিনি যেমন বৈজ্ঞানিকতাকে মানেন ঠিক তেমনি ভাবুকতাকেও মানেন। তাই তাঁর বিদ্যালয়ে ভাবুকতার বিষয়টি রয়েছে এবং তা কখনই তা ছাত্রদের চিত্ত বিকাশের পক্ষে হানিকর নয়। কারণ সেখানকার কার্যক্ষেত্র এবং শিক্ষাপ্রণালী বহু ব্যাপক।

---

[৪২] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (পঞ্চদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৯৯৫, পৃ.৮৫।
যদুনাথ সরকারের এই পত্রটি এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তর-পত্র একসঙ্গে যদুনাথ ‘বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে’ প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য প্রবাসী চৈত্র, ১৩৫২। কিন্তু প্রবাসীতে প্রকাশের সময় যদুনাথ তাঁর পত্রে কিছু পরিবর্তন করেছেন। মূলপত্র রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শন

শিক্ষা ও শিক্ষার লক্ষ্য **(Education and its aim)**

কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য হল প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা। যেখানে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অনুভূতিপ্রবণ, স্বাধীন, প্রভাবমুক্ত, বুদ্ধিসম্মত জ্ঞান নিয়ে ভয়শূন্য ভাবে জগতে বসবাস করতে সক্ষম। তাঁর মতে, শিক্ষার মাধ্যমে কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ করে, জীবিকা অর্জন করে জগতে স্থায়ী এবং সুনিশ্চিতভাবে বসবাস করা, শিক্ষার মূল লক্ষ্য নয়। জীবনের বিস্তার অনন্ত, অতল। তাই শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষা অর্জন করা হলে, জীবনের মূল লক্ষ্যটি থেকে বিচ্যুত হতে হয়। জীবিকা জীবনে অবশ্যই জরুরী। কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াটি জীবনের প্রধান লক্ষ্য কখনই নয় এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

> "So observe this whole phenomenon of life: getting a job, having a family, sex, pleasure, fear, pain, despair, anxiety, deepening sorrow, the enormity of all this, the complexity of all this. Just observe, not coldly as a scientist does through a microscope, but observe with tremendous passion."[১]

[১] Krishnamurti, J, Why are being educated?, Krishnamurti Foundation of India, 2018, p.36.

শুধুমাত্র গণিত, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ভুগোল কিম্বা অন্য কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে দক্ষতা অর্জনের থেকে জীবনকে উপলব্ধি করা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে ছাত্রদের নিজেদের প্রশ্নটি করা প্রয়োজন কেন তারা শিক্ষিত হতে চাইছে। এই তথাকথিত শিক্ষার অর্থ কী? তথা জীবনের অর্থ কী? কৃষ্ণমূর্তির মতে, প্রশ্নগুলি ছাত্র, শিক্ষক, পিতা-মাতা তথা জগতের সমস্ত মানুষের জন্যই বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাঁর মতে, শিক্ষার অর্থ শুধুমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র থেকে, পাঠ্যপুস্তক থেকে কিছু তথ্য আহরণ করা নয় বরং সেটি সত্য না মিথ্যা সেটি বিচার করা দরকার। প্রকৃতিকে অনুভব করা প্রয়োজন।

তাই তিনি বলেছেন - "Education is not only learning from books, memorising some facts, but also learning how to look, how to listen to what the books are saying, whether they are saying something true or false. Education is not just to pass examinations, take a degree and a job, get married and settle down, but also to be able to listen to the birds, to see the sky, to see the extraordinary beauty of a tree, ... touch with them."[২]

তাছাড়া শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে শিক্ষিত হয়ে একজন ছাত্র একই সঙ্গে ক্রুদ্ধ, ঈর্ষাপরায়ন, উচ্চাকাঙ্খী এবং হতাশা গ্রস্থ হয়। অন্যদিকে, সমাজে সর্বক্ষণই

---

[২] Krishnamurti, J, On Educaiton, Krishnamurti Foundation of India, 2018, p.7.

বিশৃঙ্খলা এবং জাতিবিরোধ ঘটতে থাকে। এক্ষেত্রে একজন ছাত্র শিক্ষিত হয়েও নিজের নিরাপদ থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করে। শিক্ষা বলতে কি এটাকেই বোঝায়? কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন "You know how to speak English, you are a little more cleaver, a little more tidy, a little more clean, that is all, is it not? And the boys get a technical job or become clerks or get some kind of government job, and that finishes it, does it not?"[৩] অর্থাৎ যান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবিকা অর্জন করাটাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। যে শিক্ষা একজন ছাত্রকে ইংরাজি ভাষায় পারদর্শী, পরিচ্ছন্ন, চতুর তৈরী করে। কিন্তু যান্ত্রিকশিক্ষায় পারদর্শী হলেও একজন ছাত্র সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বদা ভয় ও দ্বন্দ্বে থাকে বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। তিনি বলেছেন "So, education is, is it not, to enable you to meet all these problems. You have to he educated so as to meet all these problems rightly. That is what education is – not merely to pass a few examinations in some silly subjects in which you are not at all interested. Proper education is to help the student to meet this life so that he understands it and won't succumb, won't be crushed under it as most of us are. People, ideas, public opnion, country, climate, food – all that is constandly pushing you in a particular direction in which society wants you to go. Your

[৩] Krishnamurti, J, Talks with Students Varanasi 1954, Krishnamurti Foundation of India, 2018,p.2.

education must enable you to understand this pressure, not to yield to it, but to understand it and to break through it, so that you, as an individual, as a human being, are capable of a great deal of initiative and not merely traditional thinking. That is real education."[8] তিনি বলেন যন্ত্রবিদ্যা একটি বৃহৎ সমাজ তৈরী করলেও একটা ভালো সমাজ তৈরী করে না। ভালো সমাজ বলতে শৃঙ্খলাকে বোঝায়, যার অর্থ কখনই নিয়মানুবর্তিতা নয়। তাই একজন ছাত্রকে অনুভূতি প্রবণ হতে হবে। অতি সূক্ষ্মভাবে বিষয়গুলি চিন্তা করতে হবে। একজন ছাত্রকে নিজেকে অভ্যন্তরীন বিষয়গুলিকে উপলব্ধি করতে হবে এবং একই সঙ্গে বাহ্যিক দিকের কর্মটিতেও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

অনুভূতি বুদ্ধি ও স্বাধীনতা দ্বারাই আসে। শুধুমাত্র স্বাধীনতা থাকলেই হবে না তার মধ্যে শৃঙ্খলাটি থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা মেধার উন্মেষ ঘটায়। আর মেধা হল এক প্রকার শক্তি যা একজন ব্যক্তিকে ভয়শূন্য হয়ে চিন্তা করতে সক্ষম করে। কিন্তু যেকোনো ধরনের উচ্চাকাঙ্খা উদ্বেগ আনে। এইরূপ উচ্চাকাঙ্খা কোনোদিনই একটি স্পষ্ট, স্বচ্ছ মেধাসম্পন্ন মনের জন্ম দেয় না। আমাদের জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভয় বর্তমান থাকে। পরীক্ষায় পাশ করবার ভয়, চাকরি হারানোর ভয়, মৃত্যুকে ভয় তথা জীবনকে ভয়। এখন প্রশ্ন হল ভয়শূন্যভাবে জীবনে থাকা যায় কিনা। কৃষ্ণমূর্তির মতে

[8] Ibid, p.3.

জগৎ আসলে সুন্দর এবং সৌন্দর্যময়। তাঁর মতে আমরা প্রতিনিয়ত জগৎকে শ্রীহীন বস্তুতে পরিণত করে থাকি। তাই অনুভবের দ্বারা এর সৌন্দর্য, গভীরতা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষা কোনকিছুকে অনুকরণ করা নয়, অনুসন্ধান করা। আমাদের সমাজ, পরিবার, শিক্ষক সকলেই একটি শিশুকে এই সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলার যান্ত্রিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। আর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি শিশু সেগুলি পালন করতে থাকে। কারণ এটি মেনে নেওয়া সহজ এবং সুরক্ষিত। কিন্তু এর মধ্যে ভয় বর্তমান থাকে। এটি প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকা নয়। তাই জীবনে বেঁচে থাকার অর্থটি একজন শিশুকে নিজেকে উপলব্ধি করতে হয়। আর সেটি সম্ভব হয় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মাধ্যমে।

কৃষ্ণমূর্তির মতে সমগ্র জগৎ রাজনীতিবিদদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ, উকিল, মিলিটারি ইত্যাদি অসংখ্য উচ্চাকাঙ্খী মানুষ জগতে বসবাস করেন। এরা সকলেই উঁচুতে উঠতে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেন। সমগ্র জগতে মানুষ এই উচ্চাসনের লক্ষ্যে উন্মত্ত। একদিকে সাম্যবাদীরা লড়ছে পুঁজিবাদীদের সঙ্গে আবার সমাজবাদীরা এদের দুজনকেই বাধা দিচ্ছে। ধর্মে ধর্মে হানাহানি হচ্ছে, হিংসা (violence) র সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ সবাই সবার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ফলত পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস, ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, পৃথক রাষ্ট্রের এই প্রকার বিদ্বেষে পৃথিবীর শান্তি ব্যহত হচ্ছে। যা শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুত।

তাই কৃষ্ণমূর্তির মতে, একটি ছাত্রের কর্তব্য শিক্ষিত হয়ে সমাজের দ্বন্দ্ব বিভেদগুলি দূর করে শান্তিময় সমাজ গঠন করা। তাই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে

হলে ছাত্রদের অবশ্যই উক্ত বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে এবং নিজেকে প্রথমে শর্তমুক্ত হতে হবে, একজন মুসলিম বা একজন ক্যাথলিক্ হিসাবে কখনই নয়। এটি বুদ্ধির একটি বৈশিষ্ট্য যেখানে, একজন ব্যক্তি সচেতনরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারে যে, শর্তাধীনতা এবং পূর্ব সংস্কারের ফলাফলগুলি কিরূপে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক, জাতিভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক বিভাজন সৃষ্টি করে সমাজে।

শর্তমুক্ত মন (Unconditional Mind)

সাধারণত প্রতিটা মানুষের মন শর্তাধীন হয়। মানুষ কিছু নির্দিষ্ট শর্ত মেনে তার কর্মগুলি করে। পূর্ব শর্তগুলি নির্দিষ্ট কিছু কর্মেরই ইঙ্গিত দেয়। শর্তাধীন হয়ে মানুষ শর্তের বাইরে কোনোরকম কর্ম করেনা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, মন যেটি শর্তাধীন হয় সেটি আসলে কিরূপ? এটি কি স্থির থাকবে, নাকি শর্তের বাইরে যাবে অথবা শর্তহীন হতে থাকবে? এবং এর থেকে মুক্ত হতে হলে তার উপায়টি ঠিক কি রকম? কৃষ্ণমূর্তির মতে, এটির উত্তর খুঁজতে আমাদের বুদ্ধির অনুশীলন করতে হয়।

তাঁর মতে, শর্তহীন হতে হলে, আমরা কখনই এমন একজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করব না যিনি বলেন- 'এটা করো', 'ওটা করো'। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজে শর্তাধীন তিনি তাঁর শর্তগুলি অনুসরণ করে কিছু নির্দিষ্ট কর্মেরই আদেশ দেন। তাই শর্তহীন হতে হলে একজন ছাত্রকে অবশ্যই প্রথমে খুঁজে দেখতে হবে যে, সে কেন শর্তাধীন। তিনি বলেন, একটি শিশু একটি নির্দিষ্ট দেশে, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে এবং একটি নির্দিষ্ট

সংস্কৃতিতে বড় হয়ে ওঠে। সে তার পিতা-মাতা কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণ করে। সে তার পিতা-মাতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তার পিতা-মাতার ধর্ম হিন্দু, মুসলিম অথবা কমিউনিষ্ট বা Capitalists হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিটি পিতা-মাতা তার সন্তানকে শেখায় 'এটা করো', 'ওটা কোরোনা'। অর্থাৎ কিছু নির্দিষ্ট কর্ম শিশুটির জন্য ছেলেবেলা থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। শিশুটিকে সেই কর্মের গন্ডির বাইরে অন্য কোনো প্রকার কর্ম করার অনুমতি দেওয়া হয়না। উদাহরণ স্বরূপ ধরাযাক্ শিশুটির ঠাকুমা দৈনিক মন্দিরে যান এবং সমস্তরকম ধর্মীয় আচারণগুলি পালন করেন। এক্ষেত্রে শিশুটি শৈশব অবস্থা থেকে সেগুলি দেখে এবং ক্রমে ক্রমে সেগুলি মেনে নেয়। আবার যদি কোনো পিতা-মাতা কোনোরকম ধর্মীয় প্রথা না মানেন তখন শিশুটিও সেটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। সাধারণত শিশুর মন ও মস্তিষ্ক কাদার মত হয়। সেই কাদায় অবিরত ছাপ পড়তে থাকে। যেমন একটি রেকর্ডে খাঁজ পড়ে। কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন "The simple fact is that the mind, the brain of the child is like putty or clay and on that putty, impressions are made, like the grooves in a record. Everything is registered."[৫]

সুতরাং সমস্ত কিছু শিশুটির মনে সচেতন বা অচেতন ভাবে নথিভুক্ত হতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শিশুটি ক্রমে একজন হিন্দু বা মুসলিম বা ক্যাথলিক্ বা একজন নাস্তিকে পরিণত না হয়। বিষয়টি সম্পর্কে শিশুটি সবসময়ে সচেতনও থাকেনা। কোনো বিশেষ একটি ধর্মে শর্তাধীন হয়েই মানুষ পৃথক হতে থাকে।

---

[৫] Krishnamurti, J, On Education, Krishnamurti Foundation of India, 2018, p.24.

এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন "So in a child everything is registered consciously or unconsciously, unitil gradually he becomes a Hindu, Muslim, Catholic or a non-believer."[৬] বিশেষ বিশেষ ধর্মই মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে।

তিনি আরও বলেন "He then makes divisions."[৭] অর্থাৎ বিশেষ ধর্মে ধর্মাবলম্বী হয়েই শিশুটি বিভাজন শুরু করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোনো বিশেষ ধর্মে ধর্মাবলম্বী হয়েই জগতের প্রতিটি মানুষ বিভাজন করতে শুরু করে। যেমন আমার ধর্ম, তোমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস, তোমার বিশ্বাস, আমার জাতি, তোমার জাতি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মানুষের মন সম্পূর্ণ রূপে শর্তাধীন হলে বিভাজন গুলি স্বাভাবিক ভাবেই হতে থাকে। এখন প্রশ্ন ওঠে, কিরূপে একজন ছাত্রের মন সম্পূর্ণ রূপে শর্তহীন হবে? একজন শর্তাধীন ব্যক্তি কখনই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না এই কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কারণ তিনি নিজেই কিছু শর্ত মেনে চলেন। কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন, এই প্রশ্নের উত্তর একজন ছাত্রকে নিজেকেই উপলব্ধি করতে হবে। একজন ছাত্র শর্তাধীন কিনা সেটি প্রথমে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। অর্থাৎ সে নিজে অনুভব করবে যে সে শর্তাধীন। তাঁর মতে, কেউ বলে দিল

---

[৬] Ibid, p. 24.

[৭] Ibid, p. 24.

একজন ব্যক্তিকে যে সে একজন ক্ষুদার্ত ব্যক্তি, আর সে নিজেই জানে যে সে ক্ষুদার্ত এই দুটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

ঠিক এইরকম ভাবে, যদি একজন ব্যক্তি একটি ছাত্র কে বলে দেয় যে, সে একজন হিন্দু বা মুসলিম হিসাবে শর্তাধীন একজন মানুষ, তাহলে শর্তহীন হওয়া কখনই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ছাত্রটিকে নিজেকেই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং অনুভব করতে হবে। তাকে সচেতন হতে হবে স্পষ্টরূপে এবং আবেগহীন ভাবে। পাশাপাশি ছাত্রটিকে পূর্ব স্বীকৃত শর্ত গুলি থেকে মুক্ত হয়ে বিষয় গুলিকে চিন্তা করতে হবে। কৃষ্ণমূর্তির মতে, এইরূপ সচেতনতার বিষয়টি কঠিনতর নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন আমাদের অঙ্গুষ্ঠে কোনোরকম ব্যাথা লাগে তখন আমরা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকি এবং এটি আমাদের অন্যকে বলে দিতে হয়না।

অনুরূপ ভাবে, ছাত্রটি যদি হিন্দু হয় তাহলে, ছাত্রটিকে নিজেকে প্রত্যক্ষ করতে হবে যে, একজন হিন্দু হিসাবে সে শর্তাধীন। তাকে মন্দিরে যেতে হয়। তাকে মন্ত্রপাঠ করতে হয়। 'এটা' সে বিশ্বাস করে এবং অন্যটি করে না বা করতে চায়না এবং এই সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কে সে আত্মসচেতনও। এখন একজন ছাত্র সচেতন ও সে নিজের থেকে জানে যে সে সত্যই শর্তাধীন। তাহলে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্নটি এরূপ হবে যে, সে শর্তহীন হতে চায় কিনা এবং শর্তহীন হতে চাওয়াতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শর্তাধীন হওয়াতে আসলে ভুলটা ঠিক কোথায়? বা কেন ছাত্ররা শর্তহীন হবে? কারণ একজন ব্যক্তি হিন্দু হিসাবে বা একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে শর্তাধীন। এটি আসলে ক্ষতিকারক। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এক্ষেত্রে আদতে কী ক্ষতি হয়? তারা একইসঙ্গে তাদের

শর্ত, আদর্শ, বিশ্বাসগুলি নিয়েও তো বসবাস করতে পারেন। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন ধর্মের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে একই পথে থাকতেই পারেন। বিভেদটা তাহলে ঠিক কোথায়? যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মভিত্তিক বিভেদ রয়েছে সেখানেই দ্বন্দ্ব বর্তমান। তাঁর মতে, শর্ত হল আসলে বিভেদের একটি কারণ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের দেশে প্রায়শই হিন্দু-মুসলিম অথবা অন্য ধর্মের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে। ধর্মে ধর্মে হানাহানি হয়ে মানুষ হত্যা হয়। ধর্মীয় কারণে এসমস্ত হানাহানির প্রভাব পড়ে আমাদের সমাজে। এসমস্ত দ্বন্দ্ব হয় কারণ এক্ষেত্রে বিভেদটি বর্তমান। 'আমি মুসলিম', 'তুমি হিন্দু', এই বিভেদটাই মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরী করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও বিষয়টি ভিন্ন নয়।

একথা সত্য যে, এই পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করাটাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের শিক্ষার আদর্শও পরিপূর্ণ শিক্ষার দ্বারা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা। তাই কৃষ্ণমূর্তির মতে, একটি ছাত্রের কর্তব্য শিক্ষিত হয়ে সমাজের দ্বন্দ্ব বিভেদগুলি দূর করে শান্তিময় সমাজ গঠন করা। তাই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে ছাত্রদের অবশ্যই উক্ত বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে এবং নিজেকে প্রথমে শর্তমুক্ত হতে হবে, একজন মুসলিম বা একজন ক্যাথলিক হিসাবে কখনই নয়। এটি বুদ্ধির একটি বৈশিষ্ট্য যেখানে, একজন ব্যক্তি সচেতনরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারে যে, শর্তাধীনতা এবং শর্তের ফলাফল গুলি কিরূপে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক, জাতিভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক বিভাজন সৃষ্টি করে সমাজে। কৃষ্ণমূর্তি বলেন "This is the factor of intelligence; becoming aware that one is conditioned, then

seeing the effect of that conditioning in the world, the divisions, nationalistic, linguistic and so on and seeing that where there is division there is conflict."[৮]

সুতরাং বিভেদ থেকেই বিভিন্নপ্রকারের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধি (Intelligence)- র সাহায্যেই এটা উপলব্ধ হয় বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। এখন প্রশ্নটি হল, কীরূপে একজন ছাত্র সংস্কার মুক্ত হবে? সংস্কারহীন হতে হলে প্রথমে মনকে অবশ্যই সংস্কার মুক্ত হতে হয, এবং এক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে সচেতনতার সঙ্গে বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে নিজে উপলব্ধ করাটিকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন এবং এটি পূর্বেই আলোচিত। লক্ষ্য করা যায়, পূর্ব শর্তের ফলাফল গুলি বেশ ভয়ঙ্কর রূপ নেয় সমাজে। এটি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে জনগণকে বিভক্ত করে। সমাজে হিংসার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে একজন ছাত্রকেই বিশেষ দায়িত্বটি নিতে হয়।

ছাত্রটিকে শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি সমাজগঠনের দায়িত্ব নিতে হবে। ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বুদ্ধিসম্মত কার্য হয় কীনা। যদি প্রশ্ন ওঠে কিভাবে? অর্থাৎ কিভাবে তারা এটি করবে? তাহলে উত্তরে বলতে হয় যে, এই 'কিভাবে' শব্দটির দ্বারা বিশেষ একটি পদ্ধতিকেই বোঝায়। পূর্বনির্ধারিত বিশেষ কোনো পদ্ধতিকে অনুসরণ করে কাজটি কখনই সম্পন্ন করা যায়না। কারণ বিশেষ পদ্ধতি অনুশাসনকেই বোঝায়।

---

[৮] Ibid, p. 25.

তাই নিজের মনকে সংস্কার মুক্ত করতে হলে দেখতে হবে এটির সাথে ঠিক কী কী বিষয় জড়িত এবং কেন আমরা সংস্কারহীন হতে চাই না বা শর্তাধীন হয়ে থাকার পশ্চাতে কারণটি কী?

শর্তাধীন হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন -

"Why are you prejudiced? Because part of your conditioning is to be prejudiced, and in prejudice there is a great deal of comfort, a great deal of pleasure."[৯]

অর্থাৎ পূর্ব সংস্কারের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপনে আরাম, আনন্দ বর্তমান থাকে। এগুলির মধ্যে দিয়ে মানুষ একটি নিশ্চয়তার জীবন পায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও অনেকসময় বিষয়টি ভিন্ন নয়। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বই এর তথ্যগুলি মুখস্থ করে, পরীক্ষায় পাশ করে একটি ছাত্র নিশ্চয়তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে একজন ছাত্রের শিক্ষিত হয়েও প্রশ্ন করার ক্ষমতাটি হারিয়ে যায়। এগুলির মধ্যে দিয়ে মানুষ একটি নিশ্চয়তার জীবন পায়। কিন্তু এই শর্তাধীনতা আসলে মানুষের ক্ষতি করে। তাই মানুষের মন শর্তহীন হওয়া প্রয়োজন।

---

[৯] Ibid, p. 26.

শর্তহীন হওয়ার পাশাপাশি আমাদের চারপাশের প্রকৃতিকেও উপলব্ধি করতে হবে। একজন ছাত্রকে সচেতন হতে হবে মাটির সৌন্দর্যের প্রতি, উদ্ভিদের রং, ছায়া, আলোর গভীরতা ও পাখিদের প্রতি। অর্থাৎ একজন ছাত্রকে তার পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছুর প্রতিই সংবেদনশীল হতে হবে। একজন ছাত্রকে চিন্তা করাতে হবে যে, সে তার বন্ধু বা তার পরিচিত অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের সময় ঠিক কিরূপ আচরণ করে থাকে। কৃষ্ণমূর্তি বলেন "Now, look at the trees, at the hills, the shape of the hills, look at them, look at the quality of their colour, watch them. Do not listen to me. ... . Look not with your mind but with your eyes."[১০]

অর্থাৎ জগতের প্রতিটি বস্তুকে, একজন ছাত্রকে দেখতে হবে মন ও চোখ দিয়ে। উদ্ভিদ, পাহাড়ের আকৃতি, রক্তের গুণ সমস্ত কিছুই মন দিয়ে অনুভব করতে হবে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন দুটি দিক থেকেই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হবে। শান্তরূপে অনুভব করতে হবে তার অভ্যন্তরে কী কী ঘটছে সেটি দেখার পর। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার চিন্তা বাধা সৃষ্টি করে কর্মটিতে। এটি করতে পারলে একজন ছাত্র অবশ্যই অনুভূতিশীল হবে। আর তখন সে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ দুটি ক্ষেত্রেই বিশেষরূপে সচেতন হবে। ছাত্রটি উপলব্ধি করবে তার বাহ্যিক দিকটাই তার অভ্যন্তরীণ দিক এবং দুটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন । তাহলে যে প্রত্যক্ষ করছে এবং যা প্রত্যক্ষ করছে দুটি দিক এক হবে। সেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকই হয় পর্যবেক্ষণ।

---

[১০] Ibid, p. 26.

বুদ্ধিসম্মত জ্ঞান (Knowledge With Intelligence) :

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণত ঐতিহাসিক, গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক, ভৌগলিক, ভাষাভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করে থাকি। কৃষ্ণমূর্তির মতে জ্ঞান তিন প্রকার। (১) বৈজ্ঞানিক (২) সামগ্রিক এবং (৩) ব্যক্তিগত জ্ঞান। তিনি বলেছেন "There are these three kinds of knowledge-scientific, collective, personal."[১১] অর্থাৎ আমরা তিন প্রকারে জ্ঞান লাভ করে থাকি। একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সামগ্রিক জ্ঞান রূপে সমস্ত কিছু থেকে একপ্রকার জ্ঞান আমার হয় এবং এই সমস্ত জ্ঞান থেকে অভিজ্ঞতার দ্বারা আমার নিজস্ব একপ্রকার ব্যক্তিগত জ্ঞান হয়। এখন প্রশ্ন ওঠে, এই তিনটি প্রকারে লব্ধ জ্ঞান সামগ্রিক ভাবে কি বুদ্ধি জোগায়? অথবা প্রশ্ন উঠতে পারে জ্ঞান কি? এবং জ্ঞান কি বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বুদ্ধি জ্ঞানকে ব্যবহার করে। বুদ্ধির স্বচ্ছ রূপে, বস্তুগত রূপে, চিন্তার ক্ষমতা থাকে। কৃষ্ণমূর্তি বলেন "Intelligence is the quality of the mind that is very sensitive, very alert, very aware, ... capable of thinking very clearly, objectively."[১২]

---

[১১] Ibid, p. 20.

[১২] Ibid, p. 21.

অর্থাৎ বুদ্ধি এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনো প্রকার ব্যক্তিগত মতামত, অনুভূতি এবং পূর্বপ্রথা স্থান পায়না। 'বুদ্ধি' বলতে কৃষ্ণমূর্তি direct understanding - কেই বুঝিয়েছেন।

বুদ্ধি হল মনের একটি গুণ যা বিশেষ অনুভূতিপ্রবন, সচেতন ও সজাগ। বুদ্ধি স্পষ্টরূপে চিন্তা করতে সক্ষম এবং এটি কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িত না। কৃষ্ণমূর্তির মতে জগতে মানুষ বিভিন্ন প্রকার শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত হয়ে বসবাস করে। কোনো একটি ছাত্রের হয়ত গণিত অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যথেষ্ট জ্ঞান থাকে, ভালো একটি ডিগ্রী থাকে এবং সেই ছাত্রটি একজন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারও হয়। কিন্তু এখন প্রশ্নটি হল, ছাত্রটি একই সঙ্গে অনুভূতি প্রবণ ও সচেতনও হয় কিনা সেটি দেখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ ছাত্রটি বস্তুগত ভাবে বুদ্ধি এবং understanding সহ চিন্তা করতে সক্ষম কিনা অর্থাৎ একজন ছাত্রের জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যে ঐকটি আছে কিনা বা জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যে কোনোরকম সামঞ্জস্য আছে কিনা সেটি দেখা বিশেষ প্রয়োজন বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। এপ্রসঙ্গে ছাত্রদের তিনি প্রশ্ন করেন -

"Are you thinking objectively, clearly, with intelligence, understanding? Is there harmony between knowledge and intelligence, a balace between the two?"[১৩] প্রশ্নটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

---

[১৩] Ibid, p. 21.

অর্থাৎ জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য (harmony) থাকা বিশেষ প্রয়োজন। সচেতনতার সাথে একজন ছাত্রকে অনুভূতিপ্রবণ হয়ে বিষয়টি স্পষ্টরূপে চিন্তা করা দরকার। বুদ্ধির থেকে একজন ছাত্র শুধুই পর্যবেক্ষণ করে না, অনুভবও করে জগৎকে। তাই তিনি বলেছেন "Intelligence implies that you see the beauty of the earth, the beauty of the trees, the beauty of the skies, the lovely sunset, the stars, and the beauty of the subtlety."[১৪] তাই জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার। যার দ্বারা প্রকৃতিকে অনুভবও করা যায়।

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের দেশের ছাত্ররা এই প্রকার বুদ্ধি তাদের বিদ্যালয় থেকে, পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জন করে কি? নাকি শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় থেকে জ্ঞান আহরণ করে। কৃষ্ণমূর্তির মতে, যদি একজন ছাত্র কোনো প্রকার বুদ্ধি বা অনুভুতি ছাড়াই জ্ঞান সংগ্রহ করে, তখন সেই জ্ঞানটি ভীষণরকম ভাবেই বিপদজনক হয়। বলাবাহুল্য এইপ্রকার অনুভূতিহীন জ্ঞান ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ধরা যাক্ একজন বাক্তি পারমাণবিক বোমা তৈরির বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন কোনোরকম অনুভূতি ছাড়াই এবং সেক্ষেত্রে তিনি এই জ্ঞানটিকে হয়ত ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করতে পারেন। কৃষ্ণমূর্তি বলেন - "This is what the whole world is doing."[১৫] অর্থাৎ সমগ্র জগৎ বর্তমানে এটাই করে চলেছে, যা আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষ্য কখনই নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বুদ্ধি (intelligence)

---

[১৪] Ibid, p. 21.

[১৫] Ibid, p. 21.

ছাড়া একজন ব্যক্তির জ্ঞান (knowledge) সবক্ষেত্রেই বিপদজনক হয় কিনা? অথবা আপত্তি উঠতে পারে যে, বুদ্ধি ছাড়া একজন ব্যক্তির জ্ঞান মঙ্গলময় কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা? তাই একথা বলার কোনো কারন নেই যে বুদ্ধি ছাড়া জ্ঞান সর্বদা ধ্বংসাত্মক কর্মের কারন। অন্যদিকে, এ প্রশ্নও ওঠে যে, একজন ব্যক্তির জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত নাকি যুক্ত নয় সেটি নির্ধারিত হয় কিরূপে? উত্তরে বলা যায়, একজন ব্যক্তির জ্ঞান বুদ্ধিসম্মত হলে ব্যক্তিটি বিশেষরূপে সচেতন এবং অনুভূতিপ্রবণ হবে।

অতএব একটি ছাত্র বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে না, যেটি বুদ্ধির থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান একজন ছাত্রকে অনুভূতি প্রবণ করে, স্পষ্টরূপে চিন্তা করতে সমর্থ করে এবং এইপ্রকার জ্ঞান সমাজের জন্য মঙ্গলময় বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। আর শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রকার জ্ঞান লব্ধ না হলে একটি ছাত্রের শিক্ষিত হওয়াটি আদতে অর্থহীন বলেই তিনি মনে করেন। এই প্রকার বুদ্ধিসম্মত জ্ঞান লাভ করে একজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। যা শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য।

পিতামাতা এবং শিক্ষকের ভূমিকা (The Role of Parents and Teacher)

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকই প্রকৃতশিক্ষার দ্বারা নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলে। শিক্ষকের থেকে শুরু হয় প্রকৃত শিক্ষা। তাই শিক্ষকের আত্মোপলব্ধি থাকা দরকার। সামাজিক সমস্ত সংস্কার গুলি থেকে মুক্ত থাকা দরকার।

সাধারণত একজন শিক্ষক নিজে যেটি শেখেন তিনি তার ছাত্রদের সেটাই শেখান। সেক্ষেত্রে শিক্ষক স্বয়ং যান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে বড় হয়ে উঠলে তিনি তার ছাত্রদের সেই পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে শেখান এবং ছাত্র ছাত্রীরা সেই যান্ত্রিকতাকে মেনে নিতে থাকে। ফলত সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যার মূল কারন শিশুরা নয় বরং পিতা মাতা এবং শিক্ষকেরা। তাই কৃষ্ণমূর্তির মতে যিনি শিক্ষকতা করেন তাকে প্রথমত শিক্ষিত করে তোলাতেই সমস্যা রয়েছে। তিনি বলেছেন "The right kind of education beings with the educator, who must understand himself and be free from established patterns of thought; for what he is, that he imparts. If he has not been rightly educated, what can he teach except the same mechanical knowledge on which he himself has been brought up ? The problem, therefore, is not the child, but the parent and the teacher; the problem is to educate the educator."[১৬]

শিক্ষকরা যদি নিজেদের সম্পর্কে এবং ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক না বুঝে শুধুমাত্র তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা দেন তাহলে এর দ্বারা নতুন ধরণের শিক্ষার প্রচলন করা কখনই সম্ভব নয়। এই প্রকার তথ্যকেন্দ্রিক শিক্ষা ছাত্রদের কি ভাবে ভাবতে হয় তা শেখায় না, কি ভাবতে হবে সেটি শেখায়, যা আত্মজ্ঞান (self-knowledge)-এর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তিনি প্রশ্ন করেন - "If we who are the educators do

[১৬] Krishnamurti, J, Education and the Significance of Life, Krishnamurti Foundation of India, 2014, p.100.

not understand ourselves, if we do not understand our relationship with the child but merely stuff him with information and make him pass examinations, how can we possibly bring about a new kind of education?"[১৭] তাই শিক্ষকদের তার ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্কটি বোঝা দরকার। কেবলমাত্র তথ্যকেন্দ্রিক শিক্ষা পরীক্ষায় পাশ করতে শেখায় যা প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য নয়। এরূপ শিক্ষা কিরূপে একটি নতুন শিক্ষার প্রচলন করবে? তিনি আরও বলেন "The pupil is there to be guided and helped; but if the guide, the helper is himself confused and narrow, Nationalistic and theory-ridden, then naturally his pupil will be what he is, and education become a source of further confusion and strife."[১৮] তাই একজন শিক্ষককে ছাত্রদের নিকট সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। তার নিজের চিন্তা ভাবনা চাপিয়ে না দিয়ে যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের বিষয়ে সত্যতা কে উন্মোচন করতে পারে তার জন্য সাহায্য করতে হয়। কিন্তু সমস্যাটি হল শিক্ষক নিজেই যদি সংকীর্ণমনা, জাতীয়তাবাদী এবং বিভ্রান্ত হন তাহলে তিনি তার মতাদর্শ অনুযায়ী ছাত্রদের শিক্ষা দেবেন এবং তার ছাত্র ছাত্রীরা এই প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করবে যা বিবাদ, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে সমাজে। কারন কোনো রাজনৈতিক বা কোন নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রণালী সামাজিক সমস্যার সমাধান করে না।

---

[১৭] Ibid, p. 100.

[১৮] Ibid, p. 100.

তাই একজন শিক্ষক যখন শিক্ষকতা করতে চান তখন তার নিজেকে প্রাথমিক ভাবে যে প্রশ্নটি করা দরকার তা হল শিক্ষকতা বলতে তিনি ঠিক কি বোঝেন? তিনি কি প্রথা সিদ্ধ বিষয়গুলিকে অভ্যাস মাফিক পড়াবেন? যাতে শিশুরা পূর্ব শর্তগুলি (conditions) মেনে নিয়ে সমাজের নগন্য অংশ মাত্র হয়ে উঠবে। নাকি তিনি তাকে একজন বুদ্ধিদীপ্ত, সংবেদনশীল ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে চাইবেন যে তার চার পাশের সমস্ত মূল্যবোধকে উপলব্ধি করবে, প্রশ্ন করবে এবং আত্মজ্ঞান (self knowledge) লাভ করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষককে তার নিজের সমস্ত চিন্তাভাবনা, মতামত, কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কৃষ্ণমূর্তির মতে এই প্রকার সতর্ক ভাব থেকে প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হল প্রজ্ঞা, যা মানুষকে বন্ধন মুক্ত করে। একজন শিশুকে প্রজ্ঞাবান গড়ে তুলতে হলে আমাদের নিজেদের সমস্যা গুলির প্রথমে সমাধান করা প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, ভয় অসুখী ভাব, হতাশা থাকে এবং আমরা এগুলি থেকে মুক্ত নই। তাই আমাদের প্রথমে নিজেদের মুক্ত হতে হবে। যে শিক্ষক নিজেই ভয়ের স্বীকার তিনি কখনই ভয়হীন অবস্থার তাৎপর্য ছাত্রদের ব্যাখ্যা করতে পারেন না। অন্যদিকে তার ভয়ের প্রভাবও ছাত্রদের উপর পড়তে থাকে যা তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ নাও হতে পারে। সাধারণত ছাত্র-ছাত্রীদের পিতা-মাতা কে ভয়, ঈশ্বর সংক্রান্ত ভয় থাকে, আর তা দূরীভূত করতে হলে একজন শিক্ষকের মন কে ভয় শূন্য হতে হয়। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – "Suppose, for example, that a teacher is afraid of public opinion; He sees the absurdity of his fear, and yet cannot go beyond it. What is he to do? He can at least acknowledge it to himself, and can help his students to understand fear by

bringing out his own psychological reaction and openly talking it over with them. This honest and sincere approach will greatly encourage the students to be equally open and direct with themselves and with the teacher."[১৯] অর্থাৎ যদি একজন শিক্ষকের জনমত সংক্রান্ত ভয় থাকে এবং তিনি সেই ভয়কে অতিক্রম করতে না পারেন, তখন তিনি এটি স্বীকার করে ছাত্র ছাত্রীদের নিকট এই ভয়ের বিষয়টি আলোচনা করে তা বোঝানোর চেষ্টা করতে পারেন। এই প্রকার আলোচনা ছাত্রদের শিক্ষকের সঙ্গে কথাবলার ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহ যোগাবে। পাশাপাশি তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করতে শেখাবেন। একজন শিক্ষকের নিকট শিক্ষকতা নিছক একটি পেশা বা জীবিকা অর্জনের উপায় হলে এর মধ্যে কোনো প্রকার আন্তরিকতা থাকে না। তাছাড়া তাঁর মতে একজন আদর্শ শিক্ষক কখনই ক্ষমতাবান ব্যক্তি হবেন না। যে ব্যক্তি তার ছাত্রদের পরীক্ষায় কেবলমাত্র দক্ষভাবে প্রথম শ্রেণীতে পাস করার শিক্ষা দেন, তিনি কখনোই আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন না। তাই অনান্য জীবিকার মত শিক্ষকতা কেবলমাত্র একটি নিছক পেশা বা কাজ নয়। শিক্ষকতা এমন একটি গুরত্বপূর্ন কাজ যা একজন শিশুকে সুসংহত মানব সন্তান গড়ে তোলে। আদর্শ শিক্ষক কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে তিনি বলেন –

[১৯] Ibid, p. 107.

"Question: Whom would you call a perfect teacher?

Krishnamurti: Obviously not the teacher who has an ideal, nor he who is making a profit out of teaching, nor he who has built up and organization, nor he who is the instrument of the politician, nor he who is bound to a belief or to a country; but the perfect teacher, surely, is one who does not ask anything for himself, who is not caught up in politics, in power, in position. He does not ask anything for himself because inwardly he is rich. His wisdom does not lie in books; his wisdom lies in experiencing, and experiencing is not possible if he is seeking an end. Experiencing is not possible to him for whom the result is far more important than the means; to him who wants to show that he has turned out so many pupils who have brilliantly passed exams, who have come out as first-class M.A.s, B.A.s, or whatever it is. Obviously, as most of us want a result, we give scant thought to the means employed, and therefore we can never be perfect teachers ..... So a teacher must obviously be one who is not within the clutches of society, who does not play power politics or seek position or authority. In himself he has discovered that which is eternal, and therefore he is capable of

imparting that knowledge which will help another to discover his own means to enlightenment."[২০]

তাই শিক্ষককে সদা সতর্ক থাকতে হবে তিনি যেন কখনই ছাত্র ছাত্রীদের কর্তাব্যক্তি না হয়ে ওঠেন। আদর্শ শিক্ষককে সমস্ত রকম ক্ষমতা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, উচ্চস্থান থেকে দূরে থাকতে হয়। যিনি শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কোনো প্রকার নিজস্ব স্বার্থ খুঁজবেন না। আবার ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য শিক্ষকের সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠলে সেই শিক্ষা আত্মধারাবাহিকতারই রূপ নেয়। তাই একজন শিক্ষককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এছাড়া একজন শিক্ষককে ধনী গরিব নির্বিশেষে প্রত্যেকটি শিশুকে সমান মনোযোগে শিক্ষা দিতে হবে। তাই শিক্ষক শুধুমাত্র তথ্যের যোগানদার নন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন। যা কোনো মন্দির, মসজিদ বা গীর্জায় পাওয়া যাবে না। একটি নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হলে প্রত্যেক শিক্ষককেই আদর্শ শিক্ষক হতে হয়। যিনি ছাত্রদের শিক্ষিত করার পাশাপাশি নিজেকেও শিক্ষিত করে তুলবেন।

উক্ত বিষয়টিতে শিক্ষকের পাশাপাশি পিতামাতারও গুরুত্ব রয়েছে। কারণ অধিকাংশ পিতামাতা তাদের ব্যক্তিগত উদ্বিগ্নতাকে নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকেন । সামাজিক নৈতিক অবক্ষয়ের কথা চিন্তা করেন না। তারা তথ্যকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের সন্তানদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, বিবাহ দিতে চান, ভবিষ্যৎ জীবন

[২০] Krishnamurti, J, Educating the Educator, Krishnamurti Foundation of India, 2022, p.31.

নিশ্চিত করতে চান এবং এইটিই তাদের সন্তানদের প্রতি তাদের প্রধান এবং মুখ্য কর্তব্য হয়ে ওঠে। কৃষ্ণমূর্তির মতে এক্ষেত্রে পিতা মাতারা যেটি করতে চান বাস্তবে ঠিক তার উল্টোটি হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন- "If parents love their children they will not be nationalistic, they will not identify themselves with any country; for the worship of the State brings on war, which kills or maims their sons. If parents love their children, they will discover what is right relationship to property; for the possessive instinct has given property an enormous and false significance which is destroying the world. If parents love their children, they will not belong to any organized religion; for dogma and belief divide people into conflicting groups, creating antagonism Between man and man."[২১] তাঁর মতে, পিতামাতারা আসলে সন্তানদের ভালোবাসেন না। যদি ভালোবাসতেন তাহলে সন্তানদের উপর পরিবার প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির উপর জোর দিতেন না। ধর্মীয় অনুশাসন, বিশ্বাস মানুষের মনে বিভাজন সৃষ্টি করে, হিংসা (Violence) আনে, যুদ্ধের উৎপত্তি ঘটায়। তাই তাঁর মতে এটিকে কখনই পিতামাতার ভালোবাসা বলা যায় না যা রাষ্ট্রীয়, জাতিগত বৈরীভাব জাগিয়ে তোলে। যুদ্ধ ও ধ্বংসের সূচনা করে। পিতামাতাদের নিজেদের প্রশ্ন করা দরকার তারা কেন সন্তান চান? শুধুমাত্র তাদের সম্পত্তির দেখাশোনা করার জন্য কিম্বা তাদের নাম অক্ষয় রাখার

---

[২১] Krishnamurti, J, Education and the Significance of Life, Krishnamurti Foundation of India, 2014, p.103.

জন্য? উদেশ্যটি এইরকম হলে শিশুটি নিছক পিতামাতার বাসনার ফল স্বরূপ ভীত, হতাশাগ্রস্থ একজন ব্যক্তি হয়ে ওঠে। তাই পিতামাতাদের কোনো সংগঠিত ধর্মের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। কেননা ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে একথা পূর্বেই উল্লেখিত। পিতামাতার উচ্চাকাঙ্খা সন্তানের দ্বন্দ্বের কারন। তাই পিতা মাতাকে তাদের সন্তানদের সংবেদনশীল রূপে করে গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। পিতামাতা ও শিক্ষকের যৌথ শিক্ষার দ্বারা শিশুর প্রজ্ঞা লাভের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। যাতে একজন শিশু সমাজের সমস্ত মূল্যবোধ গুলিকে প্রশ্ন করতে শেখে। "It is the responsibility of the educator to create a new human being, to bring about a different human being fearless, self-reliant, who will create his own society."[২২] তখন শিশুটি ভিন্ন একজন ব্যক্তি হবে যে ভয়শূন্য, স্বনির্ভর এবং আপন সমাজ গঠনে সক্ষম।

ভয় (Fear)

আমরা জীবনে আনন্দকে উপভোগ করতে চাই। কিন্তু আমাদের জীবনে যতটা ভয় বর্তমান থাকে ততটা আমরা আনন্দানুভূতিকে উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিভিন্নপ্রকার ভয় থাকে এবং আশ্চর্যজনকভাবে আমরা ভয়কে জীবনের অংশরূপে মেনে নিই। প্রতিনিয়ত ভয়গ্রস্থ হয়ে থাকতে আমরা অভ্যস্থ হই।

[২২] Krishnamurti, J, On Freedom, Krishnamurti Foundation of India, 2017, p.11.

আমাদের জীবনে মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) এবং বিভিন্নরকম দৈহিক মানসিক ভয় বর্তমান থাকে। কোনো ব্যক্তি তার নি:সঙ্গতাকে, কেউ তা স্ত্রী বা স্বামীকে, কেউ সমাজকে, কেউবা তার জীবনের শূন্যতা বা একঘেয়েমিকে ভয় পেতে পারনে। এছাড়া অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কে ভয় কিম্বা মৃত্যু ভয়ও থাকতে পারে। এখন প্রশ্নটি হল আমরা কী ভয়মুক্ত হয়ে থাকতে পারি? কারণ এই ভয় আমাদের প্রকৃত অর্থে আনন্দানুভূতি-র পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এই বিষয়টি উপলব্ধি করে ভয়মুক্ত হওয়ার পথটি আবিস্কার করা দরকার।

কৃষ্ণমূর্তির মতে, ভয় থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব এবং একজন ব্যক্তির উক্ত বিষয়টিতে শুধুমাত্র তত্ত্বকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ভয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করা দরকার। ভয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং পরিকাঠামোটি উপলব্ধি করেই ভয়মুক্ত হওয়ার পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিটিকে অবশ্যই পূর্বসংস্কার মুক্ত হতে হয়। কারণ বর্তমানের সত্যতাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে পূর্ব সংস্কারগুলি বাধার সৃষ্টি করে। তাই মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা প্রয়োজন, যে মন কোনোপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না। যেমন - 'ভয় থেকে কখনো মুক্ত হওয়া যায় না' বা 'ভয়মুক্ত হওয়া সম্ভব', অথবা 'আমি কোনো কিছুতেই ভয় পাব না' - এরূপ সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছাশক্তি ভয়মুক্ত হওয়ার জন্য অর্থহীন। অর্থাৎ বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য ব্যক্তির মনকে প্রথমত প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বিষয়টি অনুসন্ধান করতে হয়।

এক্ষেত্রে 'ভয়'-এর কোনোপ্রকার নামকরণ না করে, কেন্দ্রহীন হয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

সচেতনস্তরের ভয় অপেক্ষা আমাদের লুকোনো ভয়গুলি থেকে মুক্ত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে প্রশ্নটি হল কিভাবে একজন ছাত্র বা ব্যক্তি সেগুলি উদ্‌ঘাটিত করবে? বিশ্লেষণের মাধ্যমে? অথবা বিশ্লেষণ কি মনকে ভয়মুক্ত করতে সক্ষম? ইত্যাদি। কৃষ্ণমূর্তির মতে, বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভয়মুক্ত হওয়া যায় না। কারণ বিশ্লেষণের মধ্যে শুধুমাত্র যে সময় থাকে তা নয়, তার মধ্যে বিশ্লেষকও থাকেন। এখন এই বিশ্লেষক যদি ডিগ্রীধারী, পেশাগত বিশ্লেষকও হন তাহলেও তিনি সময় নিয়ে বিশ্লেষণ করবেন এবং মূল কথাটি হল তিনি নিজেই এক পূর্বপ্রথার পরিণতি। এক্ষেত্রে ব্যক্তিটি যদি নিজেই নিজের ভয় বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে চান সেক্ষেত্রেও তিনি একজন বিশ্লেষক এবং সমালোচক, যিনি নিজেই আসলে এই ভয় কে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ 'অহং', 'আমি', 'আমিত্ব বোধ' - এগুলিকে বিশ্লেষক নিজেই তৈরী করেছেন। অনুরূপভাবে, তিনি নিজে পূর্বপ্রভাবে প্রভাবিত এবং সময়েরই পরিণতি। উক্ত বিষয়টির উপলব্ধি হলে ব্যক্তিটি উপলব্ধি করবেন যে পরিবর্তনের চেষ্টাতেও ভয় রয়েছে। এমত অবস্থায় তিনি পরিবর্তিত হওয়া থেকে সরতে চাইবেন এবং উপলব্ধি করবেন বিশ্লেষণ কখনই ভয় থেকে মুক্তি দিতে পারে না। তিনি উপলব্ধি করবেন বিশ্লেষক, বিশ্লেষণ, বিচার-বিবেচক, মূল্যায়ণ করে ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এরূপ উপলব্ধির পরে ব্যক্তিটি বিশ্লেষণ করার চিন্তা থেকে মুক্ত হন। আর তখনই তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন। তখন তার মন সময়, বিশ্লেষণ, ইচ্ছা, স্বপ্ন - সমস্তকিছুকে বাদ দিতে চায়। কারণ তখন তার মন সম্পূর্ণরূপে সংবেদনশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত হয়। এই সংবেদনশীলতা এবং বুদ্ধির মধ্য দিয়েই তিনি বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ করেন।

পরবর্তী ধাপটিতে, ব্যক্তিটি অনুভব করেন, চিন্তা আদতে ভয়ের কারণ। ভয় চিন্তারই ফল। ধরা যাক্ গতকাল আমার কোনো ব্যাথা ছিল। যেই ব্যাথার স্মৃতি আমার থাকে এবং আমি কখনই চাই না যে সেই ব্যথাটি পুনরায় ফিরে আসুক। "... fear is there fear in itself"[২৩] অর্থাৎ ভয়ের মধ্যেই ভয় থাকে। এখন গতকালের ব্যাথার চিন্তাভাবনা করা এবং সেই ব্যাথার স্মৃতিটিই আদতে আগামীকালের ব্যাথা পাওয়ার ভয়-এর কারণ। কিন্তু চিন্তা কেবলমাত্র ভয়েরই উৎপত্তি ঘটায় না। চিন্তা আবার সুখানুভূতিরও সৃষ্টি করে। ভয়কে বুঝতে হলে তাই মানুষকে তার সুখানুভূতিকেও বুঝতে হয়। ভয় এবং সুখভোগ প্রসঙ্গে কৃষ্ণমূর্তিকে প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি বলেন - "If, as you say, fear and pleasure are related, can one remove fear and so enjoy pleasure completely?

KRISHNAMURTI : Lovely, wouldn't it be? Take away all my fears so that I can enjoy myself in my pleasures. Everybody right through the world wants the same thing, some very crudely, some very subtly: to escape fear and hold on to pleasure. Pleasure – you smoke, it is a pleasure, yet there is pain within it because you may get a disease. You have had pleasure, whether as man or woman, sexually or otherwise, comfort and so on: when the other looks away you are jealous, angry, frustrated, mutilated."[২৪] আমরা প্রত্যেকেই ভয় ব্যতিরেকে কেবল সুখভোগ করতে চাই। কিন্তু সুখানুভূতি আসলে বিষয়কেন্দ্রিক। তা ক্ষণস্থায়ীও। যখনই আমরা

---

[২৩] Krishnamurti, J, Questions and Answers, Krishnamurti Foundation of India, 2019, p.37.

[২৪] Krishnamurti, J, Beyond Violence, Krishnamurti Foundation of India, 2012, p.71.

সেই বিষয়টি থেকে বিচ্যুত হই তখন আমরা হতাশ, ক্রুদ্ধ এবং উদ্বিগ্ন হই, সুখানুভূতির অভাব ঘটে। তিনি আরও বলেন -

"Pleasure inevitably brings pain (we are not saying we cannot have pleasure); but see the whole structure and you will know then that joy, real enjoyment, the beauty of enjoyment, the freedom of it, has nothing whatsoever to do with pleasure or therefore with pain or fear. If you see that, the truth of it, then you will understand pleasure and give it its proper place."[২৫] কৃষ্ণমূর্তি এখানে আনন্দ (Joy) ও সুখ (Pleasure) -এর মধ্যে সূক্ষ্ম তারতম্য করেছেন। সুখভোগ আসলে ভয় ও যন্ত্রণার কারণ। তাঁর মতে এই সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হলে উপলব্ধি করা যায় প্রকৃত আনন্দের স্বরূপটি। আনন্দ, তার সৌন্দর্য এবং তার অন্তর্নিহিত স্বাধীনভাবের সঙ্গে সুখভোগের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ প্রকৃত আনন্দের মধ্যে ভয়, যন্ত্রণা এগুলি থাকে না। বিষয়টির সত্যতা উপলব্ধ হলে তখন আমরা সুখানুভূতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিই না, কারণ তা আমাদের যন্ত্রণার কারণ। আর এই যন্ত্রণার ভয় আমাদের মনের মধ্যেই থাকে। কৃষ্ণমূর্তি যন্ত্রণাকে দুটিভাগে বিভক্ত করেছেন - শারীরিক, এবং মানসিক । তিনি বলেছেন -

"Physical pain is a nervous response, but psychological pain arises when I hold on to things that give me satisfaction, for them I am afraid of anyone or anything that may take them away from me. The psychological accumulations pevent psychological pain as long as

---

[২৫] Ibid, p. 72.

they are undisturbed; that is I am a bundle of accumulations, experiences, which prevent any serious form of disturbance – and I do not want to be disturbed. Therefore I am afraid of anyone who disturbs them. Thus my fear is of the known."[২৬] অতএব শারীরিক কারণবশত আমার যন্ত্রণা হল স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু যেগুলি আমার সন্তুষ্টির কারণ সেগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকলে সেগুলি আমার মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়। কারণ, প্রতিমুহূর্তে সেগুলিকে হারানোর ভয় আমাকে যন্ত্রণা দেয়। যতক্ষণ এইপ্রকার সন্তুষ্টিজনক মানসিক সঞ্চয় নিরাপদ থাকে তা আমার কষ্ট নিবারণ করে। কিন্তু যখনই এগুলি নষ্ট হয় বা কেউ এগুলিকে নষ্ট করে তখনই আমরা তাকে ভয় পাই। কারণ মানুষ হল অভিজ্ঞতা এবং সঞ্চয়েরই সমষ্টি। তাই দেখা যায় অজ্ঞাত কোন বিষয় নয়, জ্ঞাত বিষয় থেকেই আমরা প্রকৃতপক্ষে ভয় পাই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এই দুটি বিষয় আন্ত: সম্পর্কিত। একটিকে না বুঝে অন্যটিকে বোঝা যায় না। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি এমনটা বলতে পারেন না যে, তিনি শুধুমাত্র সুখানুভূতি চান, দু:খ নয়। ধরা যাক্ একজন ছাত্রের গত বছর পরীক্ষায় সফল হওয়ার সুখানুভূতি আছে এবং সে বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আগামীকাল সেই সুখানুভূতিটি থাকবে কিনা? - এই চিন্তাটিই ভয়ের জন্ম দেয়। অর্থাৎ চিন্তা থেকেই ভয়ের উৎপত্তি হয় - বিষয়টি সুস্পষ্ট। তাই বলা যায়, চিন্তা প্রকৃতপক্ষে সুখানুভূতিকে বিদ্যমান রাখার চেষ্টা করে আদতে ভয়েরই পরিপুষ্টি জোগায়। তাই তিনি বলেছেন -

---

[২৬] Krishnamurti, J, The First and Last Freedom, Krishnamurti Foundation of India, 2020, p.69.

"The link between pleasure and fear; the role of thought.
Thought cannot reduce the uncertain unknown to terms
of knowledge. Need to see the structure of fear.
Psychologically, tomorrow may not exist. What does
'To live wholly in the present' imply?"[২৭]

প্রসঙ্গত প্রশ্ন ওঠে, মানুষ কিভাবে চিন্তামুক্ত হতে পারে? কারণ চিন্তা হল স্মৃতির প্রতিক্রিয়া। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা স্মৃতি বর্তমান থাকে। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে, অফিসে কাজ-কর্ম করতে, বাড়ি ফিরতে আমাদের স্মৃতির প্রয়োজন হয় এবং তা থেকে মুক্ত হওয়া অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। তাই চিন্তার জন্য স্মৃতিকে দরকার। আবার এই চিন্তা ভয়ের কারণ। তাহলে এমত অবস্থায় মন কী করবে? প্রশ্নটি ওঠে। কৃষ্ণমূর্তির মতে, যে ব্যক্তিটি স্বয়ং সময়, বিশ্লেষণ, নির্ভরতার ফলাফল বিষয়ে পূর্বেই অবগত এবং তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, 'যা বিদ্যমান' তাতে ভয় থাকে আবার তা থেকে মুক্ত হওয়ার চিন্তাতেও ভয় থাকে - এইপ্রকার মনের উপলব্ধির স্তরটি অন্যরকম। কারণ পূর্বোক্ত বিষয়গুলিতে ধাপে ধাপে যাত্রা করে ব্যক্তিটির মন অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, সজীব এবং সংবেদনশীল হয়। এরূপ মন তার পূর্বসঞ্চয় গুলি বর্জন করে মুক্ত হয়। তার চিন্তার মধ্যে কোন কেন্দ্র থাকে না, যে কেন্দ্র থেকে তিনি ভালো-মন্দ, দোষ-গুণ ইত্যাদির মূল্যায়ণ করতে পারেন। তবে, পূর্বচিন্তার কেন্দ্রটি বর্তমান না থাকলেও চিন্তার অস্তিত্ব থাকে - যা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এক চিন্তা। পূর্বের চিন্তার কেন্দ্রটি যা যা ভাবায় তা হল - 'আমি', 'আমার বাড়ি', 'আমার সন্তান', 'আমার আসবাবপত্র' ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

[২৭] Krishnamurti, J, The Awakening of Intelligence, Krishnamurti Foundation of India, 2020, p.457.

অর্থাৎ ‘আমি’, ‘আমি’ এবং ‘আমি’ - তেই পূর্বকেন্দ্রটি ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখে যা দ্বন্দ্ব ও বিভাজন সৃষ্টি করে। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তিটির মন সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রহীন। আর এরূপ কেন্দ্রহীন মনই ভয়কে কোনো প্রকার নাম না দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে পারে বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। তখন বক্তিটি পূর্বে যাকে ভয় বলে জানতেন সেটি তার কাছে তখন অতীত (past)। এরজন্য শৃঙ্খলাবিহীন একপ্রকার শৃঙ্খলার দরকার বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। তাই তিনি বলেন -

> "Can you observe without the centre, not
> naming the thing called fear, as it arises?
> It requires tremendous discipline."[২৮]

আর এটি করতে পারলেই প্রকাশ্য সচেতন ভয় এবং গোপন ভয় - দুপ্রকার ভয়েরই অবসন ঘটে। তখন ব্যক্তির মন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়। তিনি বলেছেন - "when the mind is completely free, without any block, when the centre of recognition as the 'me' in not threre, you experience a certain joy? Haven't you experienced this state when the self is absent? Surely we all have."[২৯] অর্থাৎ তখন ব্যক্তিটি কেন্দ্রহীন এবং তার সত্তাটি ‘আমি’ সত্তাটি থেকে মুক্ত এবং আনন্দকে অনুভব করতে সক্ষম।

---

[২৮] Krishnamurti, J, Beyond Violance, Krishnamurti Foundation of India, 2012, p.61.

[২৯] Krishnamurti, J, The First and Last Freedom, Krishnamurti Foundation of India, 2020, p.72.

স্বাধীনতা (Freedom)

কৃষ্ণমূর্তি ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারাই একটি ব্যক্তি সঠিকরূপে চিন্তা করতে সক্ষম হয়। ব্যক্তির স্বাধীনতা আসে ভয়শূন্য মন থেকে যা সংবেদনশীল। স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? বা স্বাধীন হওয়ার অর্থ কী? সাধারণত স্বাধীনতা বলতে আমরা আমাদের ইচ্ছাগুলির পূর্ণতালাভ বা জীবনের কিছু দুঃখময় অভিজ্ঞতা, কষ্টদায়ক স্মৃতি থেকে মুক্তিলাভকে বুঝে থাকি। কিন্তু এটিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা বলা চলেনা।তাই আমাদের স্বাধীন হতে হলে নিজেদের প্রশ্ন করতে হয় আদতে আমরা স্বাধীন হতে চাই কিনা। কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন – "first let us ask ourselves if we really want to be free. When we talk of freedom, are we talking of complete freedom or of freedom from some inconvenient or unpleasant or undesirable thing? We would like to be free from painful and ugly memories and unhappy experiences but keep our pleasurable, satisfying ideologies, formulas, and relationships. But to keep the one without the other is impossible, for, as we have seen, pleasure is inseparable from pain."[৩০] অর্থাৎ আমরা আনন্দ বলতে দুঃখ থেকে নিষ্কৃতিকে বুঝে থাকি এবং স্বাধীনতা

[৩০] Krishnamurti, J, Freedom From the Known, Krishnamurti Foundation of India, 2019, p.96.

বলতে যা বুঝি স্বাধীনতার অর্থটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক একটি বিষয়। তাই তিনি বলেন "is it freedom when you are free from something-free from pain, free from some kind of anxiety? Or is freedom itself something entirely different?"[৩১] তাই স্বাধীনতার অর্থ কখনই আমাদের উদ্বেগগুলি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া নয়।

কৃষ্ণমূর্তির মতে মুক্ত হওয়ার অর্থ গভীর বোধ সম্পন্ন হওয়া বা মেধা সম্পন্ন হওয়া, যা সহজে আসেনা। জন্ম থেকেই মানুষ পিতা-মাতা, সমাজ, সংস্কৃতি, সরকার, বিশ্বাস, কুসংস্কারকে মেনে নিতে থাকে। তার সঙ্গে জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া, পরম্পরা না মানার ভয়ও বর্তমান থাকে। এই ভয় কখনই একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হতে দেয়না। কারণ স্বাধীনতা মনের এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা নেই, সুরক্ষিত থাকার ইচ্ছা নেই, সর্বোপরি ভয় নেই। তাই তিনি বলছেন, "Freedom is possible only where there is no Fear. Fear prevents one from looking. It is like a mind that lives in darkness and is searching for light. Freedom is that movement of the mind and heart when there is no fear of any kind."[৩২] অর্থাৎ ভয়শূন্যতা স্বাধীনতার জন্ম দেয়।

---

[৩১] Ibid, p. 96.

[৩২] Krishnamurti, J, Why are being Educated?, Krishnamurti Foundation of India, 2018, p.24.

প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে সুরক্ষিত থাকার ইচ্ছাটি একপ্রকার আত্মপ্রত্যয় আনে। এর থেকেই মানুষ বিখ্যাত হতে চায়। আর যখন থেকে মানুষ বিখ্যাত হতে চায় তখন থেকে সে আর মুক্ত নয়। তাঁর মতে, জগতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। কারন বিশেষ কিছু হতে চাওয়ার লক্ষ্যে মানুষ তার পিতামাতা, শিক্ষক, আদর্শ পুরুষ, গুরু কিম্‌বা কোনো মহাত্মার আদর্শকেই অনুসরণ করে থাকে। মানুষ বিশেষ কিছু পরম্পরাকে আঁকড়ে ধরে থাকে যা তাকে উচ্চাকাঙ্খী করে থাকে। আর এই উচ্চাকাঙ্খা থেকেই বিভিন্ন প্রকার ভয়ের উৎপত্তি হয় যা স্বাধীনতার বিরোধী।

কিন্তু যে মানুষ জীবনে বিশেষ কিছু হওয়ার অযৌক্তিকতাটিকে উপলব্ধি করে এবং কোনোকিছু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকেনা, তখন তার হৃদয় সহজ ও সরল হয় এবং সেই ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। তিনি বলেছেন "Can you become conscious of that freedom? If you say, 'I am free', then you are not free. It is like a man saying, 'I am happy'. The moment he says, 'I am happy' he is living in a memory of something that has gone. Freedom can only come about naturally, not through wishing, wanting, longing. Nor will you find it by creating an image of what you think it is. To come upon it the mind has to learn to look at life, which is a vast movement, without the

bondage of time, for freedom lies beyond the field of consciousness."[৩৩] অর্থাৎ স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি এটি আদতে তা নয়। যখন আমি বলি 'আমি স্বাধীন' – তখন আমি স্বাধীন নই। অনুরূপভাবেই যখন আমি বলি 'আমি সুখী' – তখন আসলে আমি একটি স্মৃতির সঙ্গেই যুক্ত থাকি যার মধ্যে সময়ও যুক্ত। তা কখনই আমাকে স্বাধীনতা দিতে পারে না। তাই স্বাধীনতা নিজস্ব কোনো স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা থেকে আসেনা, স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতাটি আসে এবং এইপ্রকার স্বাধীনতার প্রতি সচেতন হওয়ার কথাই বলেছেন।

উক্ত বিষয়টিতে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির অন্য কোন একজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করে বিখ্যাত হওয়া নয়, বরং সেই ব্যক্তিকে সহজ সরল অবস্থায় থাকতে সাহায্য করাই হল শিক্ষার কাজ। কোন প্রকার পূর্ব শর্তকে মেনে নেওয়ার মধ্যে স্বাধীনতা নেই। কিন্তু একজন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিজে যা সেটি উপলব্ধি করার মধ্যে স্বাধীনতা রয়েছে। একজন ব্যক্তির সৌন্দর্য, অসৌন্দর্য, ঈর্ষাকাতরতা এই সমস্ত কিছুকে উপলব্ধি করা আদতে কঠিন। আবার একজন ব্যক্তি সাধারণ হওয়াকে সম্মানজনক বলে মনেও করেন না। ফলত সে বিখ্যাত হতে চায়। কিন্তু এই বিশেষ হতে চাওয়ার উচ্চাকাঙ্খা জীবনে আদতে ভালো কিছু ঘটায় না। ব্যক্তিটি নিজেকে উপলব্ধি করতে পারেনা। আর নিজেকে উপলব্ধি না করতে পারলে কখনই অন্য মানুষ, সমাজকে উপলব্ধি করা যায়না।

---

[৩৩] Krishnamurti, J, Freedom from the Known, Krishnamurti Foundation of India, 2019, p.101.

কৃষ্ণমূর্তির মতে ব্যক্তির 'স্ব' (self) হল জটিল। এই সত্তাটি কেবলমাত্র এইরকম নয় - যে স্কুলে যায়, খেলাধুলা করে, ঝগড়া করে, চাকরি করে, ভয় পায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এর অতিরিক্ত একটা কিছু প্রচ্ছন্নরূপে থাকে। তাই পিতা-মাতা, বই, সংবাদপত্র ইত্যাদির থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ওই সত্তার অংশ মাত্র। আর এই প্রকার উপলব্ধি আসে কোন বাক্তির কোনোকিছুকে অনুসরণের সমাপ্তি থেকে। তাঁর মতে এটি সত্যবিপ্লব যা ব্যক্তিকে স্বাধীন করে এবং এইরূপ স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটানোই শিক্ষার অন্যতম প্রধান কাজ। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তিকে এইপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তার মেধার উন্মেষ ঘটানো যায়। সেক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিটি কোন দার্শনিক বা আদর্শবাদীর চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নতুন এক পৃথিবী গড়ে তোলে। "So ... one do to live a life in which there is complete freedom, without any contradiction."[৩৪] অর্থাৎ যেখানে একজন ব্যক্তি কোনরূপ বিভেদ ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে জীবনযাপন করবে, মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করবে।

[৩৪] Krishnamurti, J, Why are being Educated?, Krishnamurti Foundation of India, 2018, p.38.

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তি দুজনেই শিক্ষাকে বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করেছেন। এঁরা দুজনেই শিক্ষাকে জীবন থেকে পৃথক করে দেখেননি। রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকৃত শিক্ষার অর্থ হল তাই যা, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার দ্বারা সৃজনশীলতা সৌন্দর্য্যবোধ কে উপলব্ধি করতে শেখায় এবং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে মানব জীবনে পরিপূর্ণতা আনে। ঔপনিবেশিক গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ একথা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তিনি উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে সাবলীল পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মাধ্যমে শিশুর মানসিক এবং শারীরিক বিকাশের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি শুধু জ্ঞানের শিক্ষা নয় বোধের শিক্ষাকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এবং পরবর্তীকালে এটির বৃহৎ লক্ষ্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

অন্যদিকে কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন প্রকৃত শিক্ষার অর্থ কখনই পরীক্ষায় পাশ করে, জীবিকা অর্জন করে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, সুনিশ্চয়তায় জীবন-যাপন করা নয়। প্রকৃত শিক্ষা হল তাই যার মাধ্যমে একজন শিশু তার সমস্ত পূর্বসংস্কারগুলি থেকে মুক্ত হয়ে, ভয়শূন্য মন নিয়ে, সংদেনশীল হয়ে প্রকৃতি তথা জগতের সমস্ত বস্তুকে উপলব্ধি করতে পারে এবং সামাজিক হিংসা, বিদ্বেষগুলি দূর করে সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শন একটি অন্যটির পরিপূরক। যদিও কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বর্তমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা দর্শনে

একজন শিশুর মনস্তাত্ত্বিক (psychological) দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বোধের শিক্ষার মাধ্যমে একটি শিশুর আত্মবিকাশের কথা বলেছেন। আর কৃষ্ণমূর্তি একজন শিশুর আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমে তার সমস্ত পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় সংস্কারগুলি থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে শান্তিময় সমাজ গঠনের কথা বলেছেন।

এঁরা দুজনেই উন্মুক্ত প্রকৃতির মাধ্যমে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রকৃতি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং কৃষ্ণমূর্তির ঋষি ভ্যালি বিদ্যালয়েও উন্মুক্ত প্রকৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্র স্বাধীনতা, সাবলীল পাঠ্যক্রম, আচরণ শিক্ষা এবং শিক্ষকের ভূমিকাটির উপর দুজনেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাহলে তফাৎটা কোথায়? দুজনেই এক আদর্শ শিক্ষার কথা বলেছেন যা জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন যদিও কৃষ্ণমূর্তি সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের প্রভাবে শিক্ষিত নারীর ব্যর্থতা ও ফলাফল বিষয়ে আলোচনা করছেন। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা তত্ত্বে তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, রবীন্দ্রদর্শনে চেতনার স্তরগুলির সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং 'ছোট আমি'-র সংকীর্ণ স্বার্থসত্তা ত্যাগ করে থেকে 'বড় আমি'তে উত্তরণের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে কৃষ্ণমূর্তির দর্শনে, 'আমি' সত্তাটিকে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে যা আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দেয়, মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। তাই একজন শিশুর নিজের মধ্যেই তার মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির বিকাশের অভ্যাস (Practice) ঘটিয়ে সমস্ত রকম হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থসত্তাকে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রদর্শনে 'অহংকে' পরিত্যাগ করে, স্বার্থ সত্তাগুলি ত্যাগ করে পরমআত্মায় একত্ব হওয়ার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে

কৃষ্ণমূর্তি আপন স্বার্থসত্তাগুলি ত্যাগ করে উত্তম আচরণ,ভাল ব্যবহার, অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছেন। কৃষ্ণমূর্তির কাছে অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণই হল সম্পর্কে থাকা, সম্পর্কিত থাকা, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করা। তাঁর মতে, শিক্ষিত মন চিন্তা করে, শোনে, প্রশ্ন করে এবং সক্রিয় হয়ে সমাজে আনন্দ সহকারে বসবাস করে। রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শনের তুলনা করলে মূলত সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা ভাবনায় শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিকটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা রবীন্দ্রদর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি। যদিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিশু মনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তি একজন শিশুর মনস্তাত্বিক দিকটির অতি সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, যার দ্বারা একজন শিশু শৈশব অবস্থা থেকেই সংবেদনশীল, মেধাসম্মপন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত, স্বাধীন, স্বতন্ত্র একজন ব্যক্তি হয়ে ওঠে। যে সমাজের হিংসাত্মক দিকটির রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। আর সমাজের রূপান্তর ঘটাতে হলে সমাজের এক একজন ব্যক্তির রূপান্তর প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শন পর্যালোচনা করলে একটি বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেটি হল শিক্ষা বিষয়ে কৃষ্ণমূর্তির চিন্তাধারা বিশেষ কোনো ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। বিশেষ কোনো আদর্শ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নি। তাই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বেও বিশেষ কোনো ভাবধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনের উপর উপনিষদ (Idealism)-এর প্রভাব স্পষ্ট। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদীয় চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে তাঁর জীবনদর্শন এবং তাঁর শিক্ষাদর্শনও এর থেকে বাদ পড়েনি - যা পূর্বের অধ্যায়েই উল্লেখিত।

তাঁকে একজন ভাববাদী (Idealist) দার্শনিক (Philosopher) হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়। তার শিক্ষাদর্শনের মূল ভাবধারার সঙ্গে ভাববাদী শিক্ষা দার্শনিকদের ভাবনার মিল রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, সৃষ্টির মূলে আছে এক শক্তি। যা জগতের সকল ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে বিকাশমান। তিনি একে বিশ্বচেতনা বলেছেন এবং আত্মউপলব্ধি (Self-realizaton)-র মাধ্যমেই তা লাভ করা যায় বলে তিনি মনে করতেন। তাই শিক্ষার মাধ্যমে তিনি শিশুর আত্ম উপলব্ধির কথা বলেছেন। অন্যদিকে, ভাববাদী দার্শনিকগণও সেই সত্যেরই অনুসন্ধান করেছেন। "One of the major emphases of idealist philosophy is the search for truth."[১] কারণ ভাববাদী দার্শনিকগণ জীবজগৎ সহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক ভাবমূলক সত্তার বা আধ্যাত্মিক (spiritual) সত্তার অংশ বলে মনে করেন। তাঁদের কাছে জড় জগৎ ছাড়া আরও একটি জগৎ রয়েছে যা সত্য এবং নিত্য। তাঁদের মতে, এই জগৎ আধ্যাত্মিক জগৎ। আর এই জগতের অধিশ্বর হলেন ঈশ্বর। তাঁরা মনে করেন এই ঈশ্বরের মতই জগতের সমস্ত মূল্যবোধগুলিও চিরন্তন সত্য। "The idealist emphasis on the mental and spiritual qualities of human beings, has led many idealist philosophers to concentrate on the concept of individuals and their place in education. This flavor of idealism gives it a subjectivist orientation as opposed to its more objective aspects. The subjectivist side is held by many to be one of idealism's most redeeming features, especially in regard to education."[২] যেহেতু ভাববাদে অধ্যাত্ম জগৎকে গুরুত্ব

---

[১] Ozmon, Howard A., Craver, Samuel M., Philosophical Foundation of Education, Merrill, 1995, p. 15.

[২] Ibid, p. 17.

দেওয়া হয়েছে। তাই ভাববাদী শিক্ষাদর্শনেও সেই আধ্যাত্মিকতা স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রশিক্ষাতত্ত্বেও শিক্ষা কেবলমাত্র বস্তু কেন্দ্রিক নয় তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাববাদী দার্শনিক শিশু শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্লেটো, কান্ট, ফ্রয়বেল, পেস্তালাৎসি-র নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের মতোই শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধ কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার মধ্য দিয়েই এঁরা শিশুর চরিত্রের বিকাশ সাধন করতে চেয়েছেন। "Idealists generally agree that education should not only stress development of the mind but should also encourage students to focus on all things that are of lasting value. Along with Plato, they believe that the aim of education should be directed toward the search for true ideas. Another important idealist aim is character development, since the search for truth demands personal discipline and steadfast character .... . What they want in society is not just the literate, knowledgeable person but the good person."[৩] তাঁই তাদের মতে, শিক্ষার অর্থ কেবলই শিক্ষিত বা জ্ঞানী হওয়া নয় বরং একজন যথাযথ ভালো মানুষ তৈরী হওয়া। যে জীবনের সমস্ত মূল্যবোধগুলিকে উপলব্ধি করবে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, জগতের সবকিছুই পরমসত্তার অংশ। মানুষের ব্যক্তিসত্তা তার সমস্ত সংকীর্ণ স্বার্থসত্তা থেকে মুক্ত হয়ে পরমসত্তাকে উপলব্ধি করে। ছোট আমি বড় আমিতে উত্তীর্ণ হয়ে ঐক্যলাভ করে। এইপ্রকার কর্মটি মানুষ ইহজীবনেই করে, কারণ তা কঠিনতর নয়। অনুরূপভাবেই, ভাববাদ অনুযায়ী, মানুষ সর্বজনীন এক সত্তার অংশ এবং সেই

---

[৩] Ibid, p. 15.

জ্ঞান তাকে জীবন পরিসরের মধ্যেই উপলব্ধ করতে হয়। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই মানুষ চিরন্তনসত্য ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারে। আর আত্মউপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। ভাববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যথার্থ শিক্ষার দ্বারাই এইপ্রকার আত্মউপলব্ধি (self realization) লাভ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথও তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে এইপ্রকার আত্মউপলব্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাববাদী শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী, মানুষ যেহেতু আধ্যাত্মিক জীব তাই তাকে তার ভাবময় জীবন সম্বন্ধে সচেতন করাই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষার অর্থ কেবলমাত্র একটি শিশুর মধ্যে নতুন কিছু বিষয় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া নয় বরং তার মধ্যে বর্তমান সুপ্ত সমস্ত সম্ভাবনা গুলিকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করা। কৃষ্ণমূর্তি এবং রবীন্দ্রনাথের মতেও, ছাত্রছাত্রীদের অন্তরে বাইরে থেকে কোনো কিছু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় না। তাই তাঁরা বলেছেন শিক্ষকের কাজ হল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেকার সমস্ত সম্ভাবনাগুলিকে বিকাশে সহায়তা করা।

ফ্রয়বেল, পেস্তালাৎসি প্রমুখ শিক্ষাদার্শনিকগণ শিক্ষনপদ্ধতি রচনার ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর স্বত:স্ফূর্ততার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যেহেতু ভাববাদ অনুযায়ী আত্মউপলব্ধির দ্বারা সর্বজনীন আধ্যাত্মিক চেতনাকে উপলব্ধি করা যায় তাই এক্ষেত্রে আত্মশৃঙ্খলা (self-decipline)-টি থাকা বিশেষ দরকার, যেটি কৃষ্ণমূর্তি এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই অবশ্য স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন, এইপ্রকার শৃঙ্খলা বাইরের থেকে বিধিনিষেধের মধ্য দিয়ে কখনই আরোপিত করা যায় না। ভাববাদী শিক্ষাদার্শনিকদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তি শিক্ষাক্ষেত্রে একজন ছাত্রের স্বাধীনতার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ পরম এক সত্তাকে মেনে জীবন এবং শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করেছেন। যে শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বর বিকাশ ঘটিয়ে তাকে সৃজনশীল করে, সৃষ্টিশীল করে। তখন ব্যক্তিসত্তা ক্রমশ পরমসত্তাকে উপলব্ধি করতে চায়। আর কৃষ্ণমূর্তি শিশুর মনস্তাত্তিক দিকগুলির বিকাশ ঘটিয়ে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা হিংসাত্মক সমাজের রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছেন, যে ব্যক্তি সংস্কারমুক্ত, সংবেদনশীল, ভয়শূণ্য এবং স্বাধীন হয়ে সমাজের মহত্বকে উপলব্ধি করবে। এক্ষেত্রে অনন্ত বা পরমসত্তাকে উপলব্ধি করার বিষয়টি উহ্য। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে ভাবময় আদর্শ এক জীবন রচনা গুরুত্ব পেয়েছে। আর কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শনে সঠিক শিক্ষার দ্বারা মানুষের হতাশা, ভয়, দৈনন্দিন সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা গুলি সমাধানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে - যদিও দুজনেই শিক্ষার ব্যাপক অর্থটিই গ্রহণ করেছেন, যা মূল্যবোধের সঞ্চারক এবং জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিশুর আত্মবিকাশের এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা বলেছেন। যার দ্বারাই একজন ব্যক্তি যথাযথ পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। যে জগতের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য (Harmony) বিধান করবে। তখন সে তার 'অহং' থেকে মুক্ত হয়ে বড় আমিতে উত্তীর্ণ হয়ে পরম ঐক্য (Deeper Unity) লাভ করবে। অর্থাৎ 'ছোট আমি' 'বড় আমি'-র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে। জগতের প্রতিটি ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে সে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সমস্ত কিছুকে উপলব্ধি করবে। ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তাতে মিলিত হয়ে আনন্দ লাভ করবে। পরম সত্য (Truth) কে উপলব্ধি করবে -- বলাবাহুল্য যা রবীন্দ্রদর্শনেরও অন্যতম মূল বক্তব্য।

প্রতিটি মানুষের 'ছোট আমি'-র সংকীর্ণ স্বার্থসত্তাটি তার 'বড় আমি'-তে উত্তীর্ণ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষ যখন তার সংকীর্ণ স্বার্থসত্তা থেকে মুক্ত হয় এবং বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারে, তখনই সে বড় আমিতে উত্তীর্ণ হয়। নিজের কল্যাণের পাশাপাশি অপরের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যাটি হল, প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে একজন ব্যক্তির ছোট আমি থেকে বড় আমিতে উত্তরণের বিষয়টির বাস্তবায়ন কি আদৌ সম্ভব? বা হলেও তা কতটা সম্ভব? এছাড়া প্রায়গিক দিক থেকে বিষয়টি বিচার করলে আরও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঠিক কতটা প্রাসঙ্গিক? কিম্‌বা রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন কী একজন ব্যক্তির - আত্মোপলব্ধি (Self-

Realization)-র দ্বারা জীবন তথা সমাজের মূল সমস্যাগুলি সমাধান করতে সক্ষম কিনা? - প্রশ্নগুলি ওঠে এবং এক্ষেত্রে বলা যায়, রবীন্দ্রাশিক্ষাতত্ত্ব উক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের একটি সূত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী, শিক্ষাকে বর্তমান সমাজে রূপ দিতে হলে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় একথা সত্য। সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে -- এটি একটি সমস্যা। আবার এই তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে অধিকাংশ মানুষ ক্রমশ যান্ত্রিক, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, জীবনের মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেছে এটিও আরেকটি বৃহৎ সমস্যা। এই জন্যই কি আমরা শিক্ষিত হচ্ছি? কারণ এইপ্রকার শিক্ষা ভীষণভাবে জীবিকা কেন্দ্রিক। এই প্রকার যান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি অধিকাংশ মানুষ কে উচ্চাকাঙ্খী করে তোলে। তাই এইপ্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রতিনিয়ত আমরা উচ্চাসনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইছি কোনো প্রকার সন্তোষজনক মূল্যবোধ ছাড়াই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে লড়াই করছি, পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত হচ্ছে এবং আদতে আমরা ভালো থাকছিনা। আর এই যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা এই প্রকার পৃথিবীতে মানিয়ে চলার জন্যই প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তুলছে। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ কি শুধুই তাই? বোধ হয় না।

এখন এই সমস্যাটির সমাধান যদি খুঁজতে চাই তাহলে বলা যায়, বর্তমানে দেশজুড়ে শিক্ষা নিয়ে যে অব্যবস্থা এবং অরাজকতা চলছে তাতে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন কিছু সমস্যার সমাধান

নিশ্চিতরূপে দেয়। তার থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেয় এই শিক্ষাতত্ত্ব। তাই এই শিক্ষাতত্ত্বের কিছু আদর্শ যদি আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্ত করা যায় তাহলে ক্ষতি কি? কারণ এই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের যান্ত্রিকতাকে দূর করে, বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে তাকে সৃষ্টির স্বাদ পাইয়ে দিতে সক্ষম। এই প্রকার শিক্ষাতত্ত্বের মধ্য দিয়েই ছাত্রছাত্রীরা নিজেকে আবিষ্কারের পথ খুঁজে পাবে। যদিও সব সমস্যাগুলির সম্পূর্ণরূপে সমাধান নিশ্চিতরূপে সম্ভবপর নাও হতে পারে। আবার এই প্রকার শিক্ষাদর্শন ভাবনাকে কেউ কেউ হয়ত বিশ্বমানবতারূপীও বলতে পারেন। তথাপি এইপ্রকার শিক্ষাদর্শনই আমাদের বিশেষরূপে কাম্য। কারণ প্রকৃত শিক্ষাই একজন মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। বোধের শিক্ষা জীবন তথা জগতের সমস্ত কিছুর সঙ্গে মানুষের সমন্বয় সাধন করে। মানুষ, প্রকৃতি, বিশ্বজগতের সঙ্গে শিশুকে একাত্ম করে। রবীন্দ্র দর্শনের সমন্বয়-এর ভাবনাটি বোধের শিক্ষার মধ্য দিয়ে কার্যকরী হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের বোধের শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর আত্মোপলব্ধির পথটি আবিষ্কার করা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্ব পর্যালোচনা করে উক্ত সমস্যা গুলির সমাধানের ক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি হল কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্বে উল্লেখিত মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির উপর বিকাশ ঘটিয়ে একজন শিশু সাবলীলভাবে রবীন্দ্রনাথের বোধের শিক্ষার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম কিনা? - সেটি দেখা দরকার। কারণ কৃষ্ণমূর্তি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার সঠিক পরিকাঠামোর পাশাপাশি একজন শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। যদিও তার অর্থ কখনই এই নয় যে,

রবীন্দ্রনাথ শিশু মনকে অগ্রাহ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিশুমনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্বে একজন শিশুর নিজের থেকে তার মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির বিকাশের অভ্যাস (Practice) বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় নি। তাই মনে হয়, কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী, একজন শিশুর প্রাথমিক স্তর থেকেই, জীবন তথা সমাজের সমস্ত মূল্যবোধগুলিকে প্রশ্ন করা উচিত। সেগুলি সত্য না মিথ্যা তা যাচাই করা দরকার। তাকে সমস্ত সংস্কার, পূর্ব শর্ত (Condition), ভয় (Fear) থেকে মুক্ত থাকা দরকার। জাগতিক সমস্ত বিষয়ে তার সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে কোনপ্রকার উচ্চাকাঙ্খা ছাড়াই। কারণ উচ্চাকাঙ্খা বিখ্যাত হতে শেখায়। আর উচ্চাসনে উঠতে গিয়েই মানুষ স্বার্থপর (Selfish), হতাশা (Depression) গ্রস্থ, ভয় (Fear) যুক্ত এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ বিভাজন শুরু করে -- আমি হিন্দু, তুমি মুসলিম, আমার দেশ, তোমার দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি। একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করে আর যা হিংসা ও যুদ্ধকেই আমন্ত্রণ জানায়। তাই একজন শিশুকে তার পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ, ধর্মীয়, রাজনৈতিক সমস্ত রকম বিশ্বাসগুলি থেকে প্রথমে মুক্ত হয়ে, জগতের সমস্ত কিছুকে মন ও চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে হবে। নীরবতার সঙ্গে প্রকৃতিকে অনুভব করলে, তার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীন দিকটি এক হয়। আর তখন একজন শিশু সচেতন এবং সংবেদনশীল হবে। তখন সে সংস্কার মুক্ত, ভয়মুক্ত এবং স্বাধীন হবে, যে জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধকে উপলব্ধি করবে। তাই একজন ছাত্রর স্বয়ং শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি উক্ত অভ্যাস (practice) গুলি করতে পারাটাই কাম্য। এরসাথে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু শিক্ষা ভাবনাকে যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন

পাঠ্যক্রমে সংগীত নৃত্যকলা, নাটক প্রভৃতি কে স্থান দিলে ভাল। আমরা চেষ্টা করতে পারি, যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, যাতে শিশুরা প্রকৃতির মাধ্যমে স্বত:স্ফূর্ত ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাঁধাধরা নিয়ম থাকা কাম্য নয়। এছাড়া একজন শিশুকে শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষিত করা হবে না। শিশুর চিন্তন ক্ষমতা বিকাশের দিকে বিশেষরূপে নজর দিয়ে প্রকৃতিকে অনুভব করার বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে। এর দ্বারা একাকীত্ববোধ, হিংসা, যান্ত্রিকতা গুলি দূর হতে পারে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিস্তারের ভাবনাটির উপর গুরুত্ব দিয়ে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল শিশুকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মূলত নিম্নবৃত্ত শিশুরা যাতে আর্থিক সঙ্কটের কারণে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয় বিষয়টি ভাবা দরকার।

অন্যদিকে, বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের ফলে মাতৃভাষার প্রতি তাদের প্রায়শই অনীহা দেখা যায়। তাই ইংরাজি ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষাতেও শিশুদের সাবলীল করে গড়ে তোলা দরকার। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষককে সহায়কের ভূমিকা পালন করাই কাম্য। এর ফলে শিশুরা প্রশ্ন করতে শিখবে, পাঠ্য বিষয় আগ্রহী হবে এবং স্বত:স্ফূর্ত ভাবেই তা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ একজন শিশুকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, যাতে তার শিক্ষাকে কখনই জীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে না হয়। তাই শুধু জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর জগতের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবে। তখন একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। শিশুরা ভালোবাসতে শিখবে প্রকৃতিকে, মানুষকে, সর্বপোরি বিশ্ব জগৎকে। সমস্ত স্বার্থপরতা গুলি নির্মূল হবে। সম্পর্কিত সত্তার মধ্যে

দিয়েই হিংসা দূরীভূত হতে পারে। এর ফলে ভারতবর্ষের মূল ঐতিহ্যকে স্থান দেওয়া যাবে। তখন ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐক্য (Unity) লাভ করবে। তবে, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্যবহারিক চাহিদা গুলিকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করে কোন এক আদর্শ দ্বারা পরমসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়া হয়ত আমাদের মত সংসারী মানুষের পক্ষে সহজতর নয়। কিন্তু অসম্ভবও নয়। কারণ প্রতিনিয়ত আমরা একটু একটু করে চেষ্টা করতে পারি আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে। আমাদের নিজের পরিবারকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজন, আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে পারি। তাদের নানান সমস্যায় সহযোগিতা করতে পারি। যার মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করে একজন সম্পর্কিত সত্তা হয়ে উঠতে পারি। নিজের ভালো থাকার পাশাপাশি অপরের ভালো থাকার বিষয়ে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উক্ত বিষয়টি পাশ্চাত্য দার্শনিক (দরদী নৈতিকতা) ক্যারল্ গিলিগান-এর ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ তিনিও একজন ব্যক্তির নিজের ভালো থাকার পাশাপাশি অন্যের ভালো থাকার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশের মাধ্যমে এটি করতে পারলে নিজের ভালো থাকা এবং অন্যের ভালো থাকার মধ্যে দিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করার লক্ষ্যটি বাস্তবায়ন হতে পারে। আর প্রকৃত শিক্ষার মূল লক্ষ্য বোধহয় এটাই। তাই না?

তাই মনে হয়, কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্বে উল্লেখিত শিশুর মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) বিকাশের দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়ে রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্বের বোধের শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর আত্মবিকাশ ঘটানো সম্ভব হতে পারে। আর এই প্রকার যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একজন

যথাযথ পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী হবে। যে নিজের কল্যাণের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা করবে। তখন ব্যক্তিসত্তা অহংকে ত্যাগ করে পরমসত্তাকে উপলব্ধি করবে। 'ছোট আমি' 'বড় আমি'তে উত্তীর্ণ হয়ে সামঞ্জস্য (Harmony) লাভ করবে। ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐক্য (Unity) ও পরম সত্য (Truth)-কে উপলব্ধি করবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. *ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৭।*

২. *ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৩।*

৩. *ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৩।*

৪. *ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (পঞ্চদশ খন্ড),বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২।*

৫. *ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (অষ্টাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২০।*

৬. *ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৮।*

৭. *ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৬।*

৮. *ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২২।*

৯. *ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৮।*

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী,কলকাতা, ১৪২২।

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খন্ড), বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২২।

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দশ খন্ড), বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২৬।

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষোড়শ খন্ড), বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২৭।

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ,কলকাতা, ১৪২১।

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মানুষের ধর্ম ,বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ,কলকাতা, ১৪১৮।

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম ,বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,কলকাতা, ১৪১৬।

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজী সহজশিক্ষা (প্রথম ভাগ), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৯।

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজী সহজশিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) ,বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২১।

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছেলেবেলা , বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২৪।

২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, লিপিকা , বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২৭।

২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২৭।

২২. ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ, শেষলেখা , বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,কলকাতা, ১৪১৬।

২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যের পথে ,বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২২।

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী ,বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ,কলকাতা, ১৪১৯।

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দাস, নীলা (অনুবাদ), সাধনা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১৯।

২৬. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪২০।

২৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনকথা, আনন্দ, কলকাতা, ১৪২০।

২৮. পাল, প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী, আনন্দ, কলকাতা, ১৪২০।

২৯. রায়, কমলিকা, রবীন্দ্রনাথের সাধনা বক্তৃতামালা একটি দার্শনিক বীক্ষা, কারিগর, কলকাতা, ২০১২।

৩০. রায়,ডাঃ কৃষ্ণা,রবীন্দ্র মননের কয়েকটি ধারা ,রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা ,২০২১।

৩১. ঠাকুর, সুপ্রিয়, ছেলেবেলার শান্তিনিকেতন, আনন্দ, কলকাতা, ২০১২।

৩২. সেন, প্রবোধ চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৭।

৩৩. দে,রামপ্রসাদ (সম্পাদক), রবিসন্ধ্যা (প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা), বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, ২০০২।

৩৪. দে,রামপ্রসাদ (সম্পাদক), রবিসন্ধ্যা (চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা),বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, ২০০৫।

৩৫. দে,রামপ্রসাদ (সম্পাদক), রবিসন্ধ্যা (দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা),বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, ২০০৩।

৩৬. ঘোষ, অমরনাথ, রবিসন্ধ্যা বক্তৃতামালা, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ,কলকাতা, ১৯৯৫।

৩৭. সাহা,কার্তিক, রবিসন্ধ্যা বক্তৃতামালা , বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ,কলকাতা, ১৯৯৯।

৩৮. নন্দ,ডঃ বিষ্ণুপদ (সম্পাদক), বিবিধ প্রসঙ্গ বিষয় রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ,কলকাতা ,২০১৫।

৩৯. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, রবিবাসর বার্ষিক সংখ্যা ৪৫, রবিবাসর, কলকাতা, ১৪২০ ।

৪০. দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, বিশ্বভারতী , কলকাতা, ১৪০৭।

৪১. দে, সন্তোষকুমার , রবিবাসর, বেঙ্গল বুকস , কলকাতা, ১৩৯৬।

৪২. দে, রমাপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ,বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, কলকাতা, ২০১০।

৪৩. বণিক, নন্দদুলাল, রবীন্দ্রমনন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ,কলকাতা, ১৪১৬।

৪৪. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় ও আশ্রম,গাঙচিল ,কলকাতা ,২০১৫।

৪৫. রায়,সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , ১৪১৭।

৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায় ,হরিচরণ ,রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ , বিশ্বভারতী , কলকাতা, ১৪০৬।

৪৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৪১৫।

৪৮. চন্দ, রানী ,সব হতে আপন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ,কলকাতা, ১৪১৭।

৪৯. দাস, সমর, বিশ্বদরবারে নানারূপে রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ১৪১৭।

৫০. মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিমলকুমার, রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব, দে জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭।

৫১. বসু , বিষ্ণু , মিত্র, অশোককুমার (সম্পাদনা), নানা জনের রবীন্দ্রনাথ , পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১১।

৫২. ঘোষ, জ্যোতির্ময়, রবীন্দ্রমনন ও প্রগতিসংস্কৃতি , দে জ পাবলিশিং , কলকাতা, ১৪১৭।

৫৩. চক্রবর্তী , সুমিতা, বসিরুদ্দোজা ,সৈয়দ (সংকলন ও সম্পাদনা), রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরা, কারিগর ,কলকাতা, ২০১৫।

৫৪. সেনগুপ্ত ,শংকর (অনুবাদ), দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান (মূল হিবার্ট বক্তৃতামালা থেকে নির্বাচিত অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ), প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা, ২০০৮।

৫৫. বসু,শ্যামাপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও সাত ব্যক্তিত্ব ,দে জ পাবলিশিং ,কলকাতা, ২০১৪।

৫৬. ঘোষ ,অভ্র ,শিক্ষাচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১),কারিগর,কলকাতা,২০১৭।

৫৭. অবধূত কালিকানন্দ ,উপনিষদ সমগ্র ,গিরিজা লাইব্রেরি , কলকাতা ,১৪২৭।

৫৮. বসু,যোগীরাজ,উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা ,বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ২০১৭।

৫৯. ব্রহ্মচারী ,সুখেনলাল ,শিশুর মন ,বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪১৯।

৬০. বন্দ্যোপাধ্যায় ,অর্চনা,শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি ,বি. বি. কুন্ড গ্রান্ড সন্স, কলকাতা,২০১৩।

৬১. ঘোষ, অরুণ, শিক্ষাবিজ্ঞানের দর্শন ও মূলতত্ত্ব ,এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, কলকাতা, ২০১৬।

৬২. সনাতনানন্দ, স্বামী, শিক্ষা ও শিক্ষক, সূর্য পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৯।

৬৩. আচার্য ,পরমেশ, বাঙালির শিক্ষাচিন্তা , দে জ পাবলিশিং , কলকাতা, ১৪১৮।

৬৪. বাংলা দ্বিতীয় সংখ্যা , বিশ্বভারতী , কলকাতা, ২০০৭।

৬৫. বসু, নন্দলাল, শিল্প কথা , বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪০৭।

৬৬. কৃষ্ণমূর্তি, জে, ব্যানার্জী, শ্রী প্রবীর কুমার (অনুবাদক), তুমি পড়াশোনা কেন করছো?, কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা, ২০২০।

৬৭. কৃষ্ণমূর্তি, জে, পাহাড়ী, অঞ্জন (অনুবাদক), ভাববার কথা ,কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া,কলকাতা , ২০১২।

৬৮. কৃষ্ণমূর্তি,জে,ব্যানার্জী, শ্রী প্রবীর কুমার (অনুবাদক), প্রথম এবং শেষ স্বাধীনতা, কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া ,কলকাতা , ২০১৬।

৬৯. কৃষ্ণমূর্তি, জে,ব্যানার্জী,শ্রী প্রবীর কুমার (অনুবাদক), কাল এবং কালের অতীত, কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া ,কলকাতা , ২০১৫।

৭০. মার্ক লী, আর ই,ব্যানার্জী, শ্রী প্রবীর কুমার (অনুবাদক), বিশ্ব শিক্ষক (The Life And Teachings Of J. Krishnamurti গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ), সুচেতনা, কলকাতা, ২০২১।

৭১. Tagore, Rabindranath, the religion of man, Visva Bharati, Kolkata, *2015.*

৭২. Tagore ,Rabindranath, Personality, Rupa, New Delhi, *2019.*

৭৩. Tagore, Rabindranath, Sadhana, Rupa. Co., New Delhi, *2005.*

৭৪. Tagore, Rabindranath, Angel of Surplus (Ed. Sisirkumar Ghose), Visva Bharati, Kolkata, *2010.*

৭৫. Roy, Kshitis (Ed.), Education Number VOL. XIII Parts I & II, Visva Bharati, *2004.*

৭৬. Tagore, Rabindranath, On Art & Aesthetics (A selection of Lectures, Essays & Letters), Subarnarekha, Kolkata, *2005.*

৭৭. Tagore, Rabindranath, The Religion of an Artist, Visva Bharati, Kolkata, *1963.*

৭৮. Roy (Neogi), Kamalika, Essentialism and Freedom In Tagore's of Art, Thesis awarded to the J.U. for the degree of Doctor of Philosophy, *2002.*

৭৯. Krishnamurti, J., On Education, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2018.*

৮০. Krishnamurti, J., Education and The Significance of Life, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2014.*

৮১. Krishnamurti, J., Life Ahead, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2014.*

৮২. Krishnamurti, J., Why are you Being Educated? Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2018.*

৮৩. Krishnamurti, J., What Are You Doing With Your Life? Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

৮৪. Krishnamurti, J., Beginnings Of Learning, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2017.*

৮৫. Krishnamurti, J., School Without Fear, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2018.*

৮৬. Krishnamurti, J., On Fear, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2021.*

৮৭. Krishnamurti, J., On Conflict, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2017.*

๒๒. Krishnamurti, J., Talks with Students Varanasi *1954 (*the collected works of J. Krishnamurti, VOL. VIII), Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2012.*

๒๓. Krishnamurti, J., In The Problem Is The Solution (Questions And Answers Meeting In India), Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2008.*

๒๐. Krishnamurti, J., Questions And Answers, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

๒๑. Krishnamurti, J., To Parents And Teachers, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

๒๒. Krishnamurti, J., Freedom from the Known, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *1999.*

๒๗. Krishnamurti, J., The First and Last Freedom, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2020.*

๒๘. Krishnamurti, J., On Freedom, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2017.*

৯৫. Krishnamurti, J., Freedom Responsibility and Discipline, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

৯৬. Krishnamurti, J., Leaving School Entering Life Talk and Dialogues with Students, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

৯৭. Krishnamurti, J., The Awakening Of Intelligence, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2020.*

৯৮. Krishnamurti, J., The Flame Of Attention, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

৯৯. Krishnamurti, J., Beyond Violence, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2012.*

১০০. Krishnamurti, J., A Wholly Different Way Of Living, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2018.*

১০১. Krishnamurti, J., Selections From The Decades *40*s On Self Knowledge, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

১০২. Krishnamurti, J., Rajagopal, D(ed.), Think On These Things, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2021.*

১০৩. Krishnamurti, J, Skitt, David, (ed.), Facing A World In Crisis What Life Teaches Us In Challenging Times, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2017.*

১০৪. Krishnamurti, J, Krishnamurti, K. (ed.), A Door Open For Anyone, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

১০৫. Krishnamurti, K.(ed.), Krishnamurti For Beginners and Anthology, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2016.*

১০৬. McCoy,Ray. (ed.), J Krishnamurti's Letters To His School The Whole Moment Of Life Is Learning , Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

১০৭. Mark Lee, R., E., World Teacher The Life And Teachings Of J Krishnamurti, Hay House Publishers, Delhi, *2020.*

১০৮. Krishnamurti, J., Meditation, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2009.*

১০৯. Krishnamurti, J., Educating The Educator, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2022*

১১০. Krishnamurti, J., Happy Is The Man Who Is Nothing Letters To A Young Friend, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2022.*

১১১. Sykes, Marjorie, Education in Search of a Philosophy, Earthcare Books , Mumbai, *2010.*

১১২. Ahmad, Sufian, Sinha, Biswajit (Ed.), An Inventory of Tagore Literature, Sahitya Akademi, New Delhi, *2014.*

১১৩. Chaube, S.P., Recent Philosophies of Education On India, Concept Publishing Company, New Delhi, *2005.*

১১৪. MacCarthaigh, Brendan, Bhattacharyya, Sonia, Where the Teacher is at Ease, Earthcare Books, Kolkata, *2012.*

১১৫. MacCarthaigh, Brendan, Where the Child Is Without Fear, Earthcare Books, Kolkata, *2011.*

১১৬. Ozmon,Howard A, Craver,Samuel M, Philosophical Foundation of Education, Merrill, New Jersey, 1995.

১১৭. O'Connell, Kathleen M., Rabindranath Tagore The Poet as Educator, Visva Bharati, Kolkata,*2012.*

১১৮. Radhakrishnan, S., The Philosophy of Rabindranath Tagore, Companion Publishers, Boroda, *1961.*

১১৯. Maitra, SisirKumar, Rabindranath and The Philosophy of Personality, The Golden Book of Tagore, Publisher Ramananda Chatterjee, *1931 .*

১২০. Das, Sisirkumar (Ed.), The English Writing of Rabindranath Tagore VOL. III, Sahitya Akademi, New Delhi, *1996.*

১২১. Pathak, Avijit, Education and Moral Quest, Aakar Books, Delhi, *2009.*

১২২. Shah, Shambhu, Faces & Places of Visva-Bharati A collection of Photographs, Visva Bhrati, Kolkata, 2008.